Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে দাম্পত্য জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জিন্নাতুন নিসা জুঁই

রোলঃ 228020455

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে দাম্পত্য জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জিন্নাতুন নিসা জুঁই

রোলঃ 228020455

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে দাম্পত্য জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জিন্নাতুন নিসা জুঁই, আইডিঃ 228020455 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে দাম্পত্য জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

জিন্নাতুন নিসা জুঁই

আইডিঃ 228020455

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরই এর কেন্দ্রবিন্দু। আর বিয়ে হল সামাজিক রীতিসিদ্ধ একটি সম্পর্ক। তা পরিচালিত হয় বিবেকের বাগডোরে। মনে রাখতে হবে অন্তর আর বিবেকের মাঝেও অনেক ক্ষেত্রে বৈরীতার দেয়াল বাঁধ সাধে।

তাই ভালোবাসার পাশাপাশি দয়া, ছাড় দেওয়া, আন্তরিকতাবোধ না থাকলে সেই দাম্পত্য জীবন কখনওই সুখি ও আদর্শবান হতে পারে না।)

ভালোবাসার আলাপ এখানে তোলার কারণ হল-একটি সুখি দাম্পত্য জীবনাচার
তৈরীর প্রধান কারিগরই হল প্রেম বা ভালোবাসা। হ্যাঁ, প্রধানই বলতে হবে, তবে একমাত্র নয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেছেন,

ومِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون

অর্থঃ আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সৃষ্টি করেছেন স্ত্রীগণকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করো এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা-ভাবনা করে।
(সূরা রুম:২১)

যে বিষয়টি এই আয়াত থেকে উপলব্ধির তা হল-আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা বৈবাহিক পরিণয়ের জন্য দু'টি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

এক. মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা)।

দুই, রহমাহ (দয়া)।

ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, মাওয়াদ্দাহ'র অর্থ হল স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা। আর রহমাহ'র ব্যাখ্যা হল স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রী কোনো ধরণের মন্দের শিকার না হওয়া।

রহমাহ' বলতে এখানে 'স্বাভাবিক সহানুভূতি' প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। এটা তো একটা মানবীয় অবস্থা; নরম দিল চরিত্রবান যেকোন মানুষের পক্ষ হতে এটা যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রকাশ পেতে পারে।
দাম্পত্যের 'রহমাহ' আলাদা জিনিস। যদিও আমরা বিশ্বাস করি ভালোবাসা দাম্পত্য জীবনের একটা অভেদ্য রহস্য। তারপরেও বিবাহ এবং ভালোবাসার পার্থক্যটা আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে।

দাম্পত্য জীবন ঠুনকো কোনো আবেগ নয়। উপন্যাসের পাতায় আঁকা প্রকৃতির চিত্র বা গানের সুরে বয়ে যাওয়া খড়কুটো নয়। সুদীর্ঘ এক সিঁড়ির নাম দাম্পত্য-যার প্রতিটি ধাপ গড়ে ওঠে যাপিত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের 'মশলা'র কাঁচামালে। নিয়মিত বাড়তে থাকে পরিধি-বিস্তৃতি।

এ জীবনটা নিয়ে আসলেই ব্যাপকভাবে চিন্তা করা উচিত। এখানে অর্জনীয়-বর্জনীয় অনেক কিছুই থাকে। কিছু হাসি, কিছু কান্না। প্রবল ঝড়ের মাঝেও টিকে থেকে উত্তাল তরঙ্গের বুক চিরে সটান বুকে জীবন তরী চালিয়ে যাওয়া। প্রলয়ংকারী ঝড়ের মুখেও টিকে থাকার সাহস না হলে এ সমুদ্র পাড়ি দেওয়া কঠিনই হয়ে থাকে। আর ঝড় থামিয়ে দেওয়ার অলৌকিক জিয়নকাঠি হল, কুরআনে বর্ণিত দুই গুণ-'মাওয়াদ্দাহ' ও 'রহমাহ'।

দাম্পত্য জীবনের তাৎপর্য

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে টিকে থাকার জন্য সে বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এসব সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে গভীর, ঘনিষ্ঠ, ও আবেগনির্ভর সম্পর্ক হলো দাম্পত্য সম্পর্ক। এটি শুধু একটি সামাজিক বা বৈধ চুক্তি নয়; বরং এটি দুটি মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির এক অনন্য বন্ধন। একজন নারী ও একজন পুরুষ পরস্পরের প্রতি আজীবনের জন্য ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং সহানুভূতির অঙ্গীকার করে যে জীবন শুরু করেন, তাকেই দাম্পত্য জীবন বলা হয়।
প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ গঠনে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকে সুসংগঠিত রাখার জন্য পারিবারিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় এবং সেই কাঠামোর মূল ভিত্তিই হলো বিবাহ বা দাম্পত্য জীবন। একটি পরিবার গঠনের মাধ্যমেই সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। একটি স্থায়ী ও সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু একটি পরিবারই নয়, বরং একটি জাতি গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে। দাম্পত্য জীবন মানুষকে নৈতিকতা, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা শেখায়।

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ গঠনে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকে সুসংগঠিত রাখার জন্য পারিবারিক কাঠামোর প্রয়োজন হয় এবং সেই কাঠামোর মূল ভিত্তিই হলো বিবাহ বা দাম্পত্য জীবন। একটি পরিবার গঠনের মাধ্যমেই সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। একটি স্থায়ী ও সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক শুধু একটি পরিবারই নয়, বরং একটি জাতি গঠনের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে। দাম্পত্য জীবন মানুষকে নৈতিকতা, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা শেখায়।

দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো ভালোবাসা ও মানসিক বোঝাপড়া। এই জীবন শুরু হয় পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে। ভালোবাসা হল সেই অনুভব, যা একজন মানুষকে আরেকজনের প্রতি নিবেদিত করে তোলে। দাম্পত্য সম্পর্কে এই ভালোবাসাই সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হয় এবং একে অপরকে আরও বেশি বোঝার ও মেনে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলে। দাম্পত্য জীবন দুইজন মানুষকে কেবল একত্র করে না, বরং তাদের মন, অনুভূতি ও জীবনের লক্ষ্যকে একসুতোয় বেঁধে দেয়।

একটি সফল দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান দিক হলো দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। বিবাহিত জীবনে একজন পুরুষ ও একজন নারী উভয়েরই কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সংসার

চালানো, পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা, পরিবারের সদস্যদের যত্ন নেওয়া, সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা — এসবই দাম্পত্য জীবনের অঙ্গ। একজনের দোষ-ত্রুটি অন্যজন গ্রহণ করতে পারে বলেই সম্পর্ক টিকে থাকে। ত্যাগ ও সহনশীলতাই দাম্পত্য জীবনের আসল সৌন্দর্য।দাম্পত্য জীবনই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম ও গঠনের পথ সুগম করে। একটি সুস্থ ও সুখী দাম্পত্য জীবনই একটি সন্তানের জন্য নিরাপদ, আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবেশ তৈরি করতে পারে। সন্তানের চরিত্র গঠন, শিক্ষা, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের বীজ দাম্পত্য সম্পর্ক থেকেই রোপিত হয়। তাই সুস্থ দাম্পত্য জীবন না থাকলে পরবর্তী প্রজন্মও অনিশ্চয়তায় ভোগে।

দাম্পত্য সম্পর্ক একজন মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিবাহ একজন মানুষকে দায়িত্ববান ও নিয়ন্ত্রিত করে তোলে। একজন বিবাহিত মানুষ যখন তার সঙ্গীর প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। দাম্পত্য জীবন আত্মত্যাগ, ধৈর্য, সহানুভূতি ও ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দেয়, যা মানুষকে নৈতিকভাবে আরও পরিপক্ক করে তোলে।
মানুষ একা থাকতে পারে না। জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই, দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যার মুহূর্তে একজন কাছের মানুষের সাহচর্য প্রয়োজন হয়। দাম্পত্য জীবন সেই সাহচর্য ও মানসিক প্রশান্তির উৎস। একজন জীবনসঙ্গীর সহযোগিতা, উৎসাহ ও স্নেহ একজন মানুষকে মানসিকভাবে দৃঢ় করে তোলে। জীবনের যেকোনো সংকটে একজন জীবনসঙ্গী যখন পাশে থাকে, তখন সেই সংকট অনেকটাই সহজ হয়ে ওঠে।

যদিও দাম্পত্য জীবন অনেক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তবুও এই জীবনে নানা ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে। মতভেদ, অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি, পারিবারিক চাপ বা অর্থনৈতিক সংকট – এসব কারণে দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়েন তৈরি হতে পারে। কিন্তু এসব সমস্যা পারস্পরিক যোগাযোগ, সহনশীলতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা যায়। একজনকে আরেকজনের কথা মন দিয়ে শুনতে হবে, অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং সময় দিয়ে সম্পর্ককে পুষ্ট করতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, দাম্পত্য জীবন হলো মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধু দুটি মানুষের মাঝে সম্পর্ক নয়, বরং একটি সমাজ, একটি পরিবার ও একটি জাতির ভিত্তি। দাম্পত্য জীবন মানুষকে পূর্ণতা দেয়, তাকে ভালোবাসা, দায়িত্ব ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। এই সম্পর্ক যতটা গভীর, ততটাই স্পর্শকাতর। তাই একে

গুরুত্ব দিয়ে গড়ে তুলতে হয়, সময় দিতে হয়, এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ধরে রাখতে হয়। একটি সুখী ও স্থায়ী দাম্পত্য জীবনই মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দেয়।

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব

প্রতিটি সৃষ্টিকুলে বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনগুলোর একটি নিদর্শন। এটি জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মাঝে সাধারণভাবে উন্মুক্ত। আর মানুষের প্রসঙ্গটি মহান আল্লাহ তার অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যৌনচর্চা করার পথ খোলা রাখেননি। বরং তার উপযুক্ত সম্মানজনক বিধি-বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যার দ্বারা মানব জাতির মর্যাদার রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্মান হেফাযত হয়। আর তা হলো শরিয়ত সম্মত বিবাহ। এর দ্বারা একজন পুরুষের অপর মহিলার সাথে সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন হয়। এটি উভয়ের সন্তুষ্টি ও ইজাব-কবুল এবং ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের প্রতীক। এর দ্বারা সঠিক পদ্ধতিতে যৌন চাহিদা মেটানো হয়। আর বংশানুক্রম বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং মহিলারা হেফাজতে থাকে প্রত্যেক ক্ষতিকারীর ক্ষতি থেকে।

বিবাহর ফযীলত: বিবাহ হলো সকল নবী-রাসূলের সবচেয়ে গুরুত্ব একটি সুন্নাত। যে সুন্নাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةٌ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون.َ

"আর এক নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পারিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে।"
[সূরা রূম: আয়াত-২১]

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ٌ

"আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।" [সূরা রা'দ: আয়াত-৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوْجُ، فَإِنَّهُ أَغَضُ الْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّوْمِ فَإِنَّهُ له وجاء.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা নবী করীম -এর সাথে এমন সব যুবক ছিলাম যাদের কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ আমাদের জন্য বললেন: "হে যুবকের দল! তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি 'বা'আত' তথা দৈহিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে; কারণ এটি চক্ষুকে নিচু রাখে এবং যৌনাঙ্গকে সংরক্ষণ করে। আর যে সক্ষম হবে না তার প্রতি রোষা; কারণ রোযা হল তার যৌন ক্ষমতার জন্য দমনকারী।"
(বুখারী: হাদীস নং ৫০৬৬ শব্দ তারই মুসলিম হাদীস নং ১৪০০)

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি

বিয়ে মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি শুধু দাম্পত্য জীবনের সূচনা নয়, বরং সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলাম ধর্ম বিয়েকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং এটিকে ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করে। বিয়ে শুধু দৈহিক চাহিদা পূরণের উপায় নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তি গড়ার অন্যতম মাধ্যম।ইসলামে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি, মানসিক শান্তি ও একটি সুন্দর পরিবার গঠন। কুরআনে বলা হয়েছে,

“আর তিনি তার মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া, যাতে তোমরা তাদের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করো এবং তিনি তোমাদের মাঝে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা আর-রূম, আয়াত ২১)।

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু শারীরিক নয়, বরং তা এক গভীর আত্মিক বন্ধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

ইসলামে বিয়েকে অর্ধেক দ্বীন বলা হয়েছে। হাদীসে নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিয়ে করলো, সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করলো।" (বায়হাকি)।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, বিয়ে মানুষের চরিত্র গঠনের এবং আত্মসংযমের একটি মাধ্যম। বিয়ের মাধ্যমে মানুষ বৈধ পথে নিজের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়।হাদিসশরিফে বর্ণিত হয়েছে-

مِنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوْجُ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْفَظُ لِلْفَرَجِ

"যারা বিয়ের সামর্থ রাখে তারা যেনো বিয়ে করে নেয়। কেননা তা দৃষ্টি অধিক অবনত করে, লজ্জাস্থান অধিক সংরক্ষণ করে। তথা দৃষ্টি ও সতীত্ব রক্ষা সহজ করে দেয়।"

সাধারণত বিয়ে করলে সুস্থপ্রকৃতির মানুষের জন্য সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা সহজ হয়ে যায়। যারা নোংরা প্রকৃতির অধিকারী; যারা এক বিয়ে, দুই বিয়ে, চার বিয়ে করেও পবিত্র জীবনে অভ্যস্ত হতে পারে না বরং 'মোতয়া বিয়ে'তে টাকার বিনিময়ে সাময়িকভাবে বিয়ে করা। পূর্বআরবে এর প্রচলন ছিলো। ইসলাম পরে এটি হারাম করে। এটি ব্যভিচারের মতোই

হারাম। লিপ্ত হয় তাদের আলোচনা এখানে করা হয়নি। কারণ, এখানে মানুষের আলোচনা করা হয়েছে কোনো পশু বা বাঁদরের আলোচনা করা হয়নি। [হুকুকুল জাওজাইন: পৃষ্ঠা: ১৫৭]

বিয়ের জন্য ইসলামি নির্দেশনা:

ইসলাম বিয়েকে সহজ ও সুনিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দিয়েছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, “সবচেয়ে কল্যাণময় বিয়ে সেই, যেখানে খরচ কম।” (আবু দাউদ)।
বিয়েতে মহর নির্ধারণ, উভয় পক্ষের সম্মতি, এবং ওয়ালির উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। এছাড়া, বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ওপর অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যেন উভয়ের মাঝে সুবিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে।যখন সমাজে বিয়েকে কঠিন করে তোলা হয় বা মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে বিয়ে বিলম্ব করে, তখন ব্যভিচার, সামাজিক অস্থিরতা এবং পারিবারিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হয়। ইসলাম এ থেকে বাঁচার জন্য বিয়েকে সহজ ও উৎসাহব্যঞ্জক করেছে।

ইসলাম নারীর সম্মান রক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথ হিসেবে বিয়েকে দেখেছে। পুরুষকে স্ত্রীকে সম্মান করা, ভালোবাসা দেখানো এবং প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনি নারীকেও স্বামীর প্রতি আনুগত্য, সহযোগিতা এবং সংসার পরিচালনায় ভূমিকা রাখতে বলা হয়েছে।ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিয়ে একটি পবিত্র চুক্তি এবং সমাজ গঠনের ভিত্তি। এটি মানবজীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম। বিয়ের মাধ্যমে শুধু দুটি মানুষের নয়, দুটি পরিবারেরও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী বিয়ে করা ও তা সুন্দরভাবে পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। আজকের সমাজে বিয়ের প্রকৃত রূপ ও গুরুত্ব বুঝে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করাই আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ।

বিয়ের সঙ্গা ও উদ্দেশ্য

বিবাহ কি?: বিবাহ হচ্ছে শরিয়তের একটি বন্ধন, যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর আপোষে একে অপরকে সম্ভোগ করা বৈধ হয়ে যায়।

বিবাহের হুকুম

১. যার যৌন ক্ষুধা রয়েছে এবং যেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় নেই তার জন্য বিবাহ করা সুন্নত; কারণ এর মাঝে রয়েছে নর-নারী ও উম্মতের অনেক উপকার।

২. যে ব্যক্তি বিবাহ না করলে যেনায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার প্রতি বিবাহ করা ওয়াজিব। নবদম্পতি তাদের বিবাহ দ্বারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহর হারামকৃত যেনায় লিপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষণের নিয়ত করবে। এর ফলে তাদের মধুর মিলন সদকায় পরিণত হবে।

বিবাহের উদ্দেশ্য

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"আল্লাহর অসীমত্বের নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের উপকারের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তিলাভ করো। তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও সহানুভূতি।"

নারীকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাদের মাধ্যমে তোমাদের মন শান্ত ও স্থির হয়। হৃদয় আপ্লুত হয়। স্ত্রীরা পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য। আমি বলি, ভালোবাসার সময় যৌবনকাল। এ সময় উভয়ের মধ্যে আবেগ থাকে। সহানুভূতির সময় উভয়ের বৃদ্ধকাল। বাস্তবেও দেখা গেছে, বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী বা স্বামী ছাড়া কেউ পাশে থাকে না।
১. বিবাহ এমন একটি কাজ যা দ্বারা সৎ পরিবেশ ও সুন্দর সমাজ গঠন এবং পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে সাহায্য করে। আর জীবনকে পূত-পবিত্র রাখে ও হারামে পতিত হওয়া থেকে সংরক্ষণ করে। এটি এক বাসস্থান ও প্রশান্তি। এর দ্বারা সৃষ্টি হয় ভালোবাসা, প্রণয়, মিল-মহব্বত ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রসারিত হয় প্রফুল্লতা।

২. বিবাহ হচ্ছে: সন্তান জন্মের সর্বোত্তম পন্থা এবং বংশকুল সংরক্ষণের পাশাপাশি বংশ বিস্তার করার জায়েয পদ্ধতি। এর দ্বারা জন্ম নেয় আপোষের মাঝে পরিচিতি, সাহায্য-সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব।

৩. বিবাহ হচ্ছে- যৌন চাহিদা মেটানোর এক উত্তমপন্থা এবং হরেক করমের রোগ-বালা থেকে নিরাপদে থেকে যৌন চাহিদা পূরণ করার একমাত্র হালাল পন্থা।

৪. বিবাহের দ্বারা সৎ পরিবার গঠন হয়, যা সুন্দর সমাজের জন্য একটি ভাল বীজ স্বরূপ। স্বামী কষ্ট করে আয় উপার্জন করে, খরচ ও ভরণ পোষণ করে আর স্ত্রী সন্তানদের লালন-পালন করে এবং সংসার পরিচালনা ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে। এর দ্বারা সুসংগঠিত হয় সমাজের অবস্থা।

৫. বিবাহ দ্বারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব স্বভাব পরিতৃপ্তি হয় যা সন্তানদের উপস্থিতিতে বেড়ে যায়।

৬.পবিত্রকোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন-

ًخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "আল্লাহপাক তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য জোড়া [সঙ্গী] সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের থেকে শান্তিলাভ করো। আর তিনি তোমাদের মাঝে দান করেছেন ভালোবাসা ও দয়ার্দ্রতা।"

অন্যত্র বলেন-

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

"তোমাদের স্ত্রীগণ (সন্তান উৎপাদনের জন্য) তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ।"

৭. স্ত্রীকে বানানো হয়েছে পুরুষের আরাম ও শান্তির জন্য। বিষণ্নতা, দুঃশ্চিন্তা ও নানা কর্মব্যস্ততার মাঝে স্ত্রী শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের অনুরাগী। স্ত্রীর সঙ্গে মানুষের বিরল ও আশ্চর্য ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়।

মেয়েরা সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। সন্তানপ্রতিপালন, গৃহব্যবস্থাপনার দায়িত্বশীল ও সবকাজের শ্রেষ্ঠ সহযোগী। ফলে তার সঙ্গে ভালোব্যবহার করতে হবে। স্ত্রী ইজ্জত, সম্মান, সম্পদ ও সন্তান সংরক্ষণকারী ও এর পরিচালক। স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্পদ, সম্মান ও দীনের সংরক্ষণ করে।

৮. মানুষ সৃষ্টিগতভাবে জৈবিকচাহিদা বা কামভাবের অধিকারী। স্ত্রী পুরুষের কাম-চাহিদা পূরণ করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ।' তারা বীজ উৎপাদনের উপযোগী। যেভাবে ক্ষেতের সেবা-যত্ন করা হয় এবং তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। তেমনিভাবে স্ত্রীরও বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে যা থেকে উপকৃত হওয়া উচিত।

৯. নারীর প্রতি পুরুষের যে আগ্রহ ও চাহিদা রয়েছে' এবং পুরুষের প্রতি নারীর যে আগ্রহ ও চাহিদা রয়েছে তা প্রাকৃতিক। বিয়ের মাধ্যমে তা পূরণ করলে মানুষের অন্তরে প্রকৃত ভালোবাসা ও পবিত্র চিন্তা-চেতনা তৈরি হয়। আর অবৈধভাবে পূরণ করা হলে তা মানুষকে অপবিত্র জীবনের প্রতি নিয়ে যায়। অন্তরে নোংরা চিন্তা ও কল্পনা সৃষ্টি করে। সুতরাং বিয়ে পবিত্র জীবনের অনুগামী করে এবং নোংরা জীবন থেকে ফিরিয়ে রাখে।
[আল মাসালিহুল আকলিয়্যা: পৃষ্ঠা: ১৯২]

বিয়ে করবে কোন নিয়তে

১. পবিত্র কোরআনে বিয়ের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে, সংযম ও পবিত্রতা অর্জন করা, শারীরিক সুস্থতা ও বংশধারা ঠিক রাখা ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য হলো, সংযম ও সুসন্তান লাভ করা। যেমন বলা হয়েছে-

مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"তোমরা সংযম ও পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিয়ে করো। শুধু যৌনচাহিদা মেটাতে বিয়ে করো না।"

২. অন্যত্র বলা হয়েছে-

ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُم

"(সন্তানলাভের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার দ্বারা) সন্তান কামনা করো। আল্লাহ যা তোমাদের ভাগ্যে রেখেছেন।"

৩. বিয়ে করলে মানুষের জীবন একটি রুটিনের মধ্যে চলে আসে। সে নিয়মানুবর্তী হয়, অধিক উপার্জনের চিন্তা করে, অযথা কাজ করে না; তার মধ্যে ভালোবাসা, লজ্জা, আনুগত্য সৃষ্টি হয়। মানুষ সমৃদ্ধ ও সুস্থ জীবনযাপন করে।

৪. বিয়ে সুস্থতা, আত্মপ্রশান্তি, আনন্দমুখর সুখী জীবন ও উভয় জগতে সফলতালাভের মাধ্যম।

৫. বিয়ে মানবসভ্যতার জন্য আল্লাহর অনন্য উপহার। দেশপ্রেমের শক্তভিত্তি।

দেশ ও জাতির উচ্চতর সেবা। নানারকম রোগ-বালাই থেকে বেঁচে থাকার কার্যকরী মাধ্যম বা পথ্য। আল্লাহতায়ালা যদি মানবসমাজে বিয়ের বিধান দান না করতেন তবে পৃথিবী আজ বিরান হয়ে যেতো। না কোনো মানুষ বা সমাজ থাকতো; না কোনো বসতি বা বাগান থাকতো।

বিয়ের ভ্রান্তউদ্দেশ্য

নারীদের জানা-ই নেই যে, বিয়ের উদ্দেশ্য ভরণ-পোষণ না-কি বৈবাহিকজীবনের কল্যাণ? যদি খাওয়া-পরার সংস্থান হওয়া বিয়ের উদ্দেশ্য হতো, তবে তারা বিয়ে করতো না যারা খাওয়া-পরায় স্বচ্ছল বা যে নারীরা ধনী। অথচ রাজার মেয়েও বিয়ে করে। ফলে বুঝা গেলো, বিয়ের উদ্দেশ্য স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণ।

বিয়ের সবচেয়ে বড়োউদ্দেশ্য

বিয়ের সবচেয়ে বড়োউদ্দেশ্য সন্তানলাভ করা। রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন-

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যারা অধিক সন্তান প্রসব করে এবং অধিক বাসে। কেননা কেয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা আমি অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব করবো।”

বিয়ে সম্মান অর্জনের মাধ্যম

পোশাক যেমন মানুষের শোভা বা সৌন্দর্য তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীর জন্য শোভা। স্ত্রীও স্বামীর জন্য শোভা। স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভা বা সৌন্দর্য এভাবে যে, স্ত্রী-সন্তান থাকলে মানুষ তাকে সম্মানের চোখে দেখে। কারো কাছে ধার বা আর্থিক সাহায্য চাইলে সহজে পায়। কারণ, মানুষ জানে সে একা নয়। বরং তার সঙ্গে আরো দু'-একজন মানুষের রুটি-রুজি সম্পৃক্ত। তাকে সাহায্য না করলে তাদের কী হবে। অবিবাহিত মানুষকে সহজে ঋণ দেয়া হয় না। দুনিয়াদারদের দৃষ্টিতেও সে কম সম্মানের অধিকারী।

বিবাহিতপুরুষকে মানুষ চরিত্রহীন মনে করে না। তাদের থেকে নিজের স্ত্রী-সন্ত ানকে নিরাপদ মনে করে। অবিবাহিতপুরুষকে মানুষ লালায়িত ও চরিত্রহীন মনে করে। তাদেরকে নিজের স্ত্রী-সন্তানের জন্য হুমকি মনে করে।

এমনিভাবে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীরও সম্মান বাড়ে। মেয়েদের বিয়ে হলে মানুষ তাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ করে না। স্বামী পাশে থাকুক বা দূরে থাকুক যতো সন্তান হবে তা স্বামীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। তাছাড়া বিয়ের আগপর্যন্ত মেয়েদের ইজ্জত-অনিরাপদ থাকে।

অবিবাহিত থাকার ক্ষতি

বিয়ে পোশাকতুল্য' হলে অবিবাহিত থাকা উলঙ্গ থাকার নামান্তর। বিয়েকে পোশাকতুল্য বলার উদ্দেশ্য এ কথা বুঝানো, সামর্থ থাকার পরও কোনো নারী-পরুষের জন্য অবিবাহিত থাকা দোষণীয়।

যেহেতু বিয়ের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই বিয়ে না করলে বিভিন্ন ফেতনা বা বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। নানা কুমন্ত্রণা ও আশংকা দেখা দেয়। যা ইবাদতের স্বাদ ও স্থিরতা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেয়। এসব আশংকা ও কুমন্ত্রণার ফলে অনেক মানুষের কাছে ইবাদত করা বোঝা মনে হয়। কেউ কেউ নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। আবার কেউ সামাজিক সম্মানরক্ষার জন্য নারীঘটিত সম্পর্ক এড়িয়ে চললেও অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। যা নারীঘটিত সম্পর্ক থেকেও মারাত্মক অপরাধ ও পাপ। কেননা নারী পুরুষের জন্য বৈধ একটি মাধ্যম। আর পুরুষ পুরুষের জন্য সবসময় হারাম বা অবৈধ। অনেকে মূল অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকলেও তার পূর্বকাজ যেমন, চুমু
খাওয়া, স্পর্শ করা ইত্যাদি করে থাকে, যাতে মানুষের সন্দেহ না হয়। এমনকি তারা নিজেরাও তাকে স্নেহসুলভ ভালোবাসা মনে করে।

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ بَطَنَ

"আমরা আল্লাহর কাছে সমস্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ফেতনা থেকে আশ্রয়প্রার্থনা করি।”

অনেকে প্রয়োজন ও সামর্থ উভয় থাকার পরও বিয়ে করে না। কেউ কেউ প্রথম থেকেই বিয়ে করে না। কেউ কেউ স্ত্রী মারা গেলে বা তালাক দিলে পুনরায় বিয়ে করে না। অথচ প্রয়োজন ও সামর্থ-উভয় থাকলে বিয়ে করা ফরজ।

বিয়ের উপকারিতা

মানুষের ভেতরে যে জৈবিক চাহিদা থাকে যদি তা পূরণের একটি বৈধ মাধ্যম না থাকে তবে সে তা যথেচ্ছা পূরণ করবে। তার থেকে নির্লজ্জতা প্রকাশ পাবে। এজন্য শরিয়ত বিয়ে বৈধ করে মানুষের জৈবিকচাহিদাপূরণের একটি বৈধমাধ্যম নির্ধারণ করেছে। বিয়ের বৈধতা প্রমাণ করে শরিয়ত মানুষের বুদ্ধি ও বিবেকের তুলনায় অধিক কল্যাণকামী।

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা হলে বিবেক বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে না।

কেননা একজন অপরিচিত পুরুষের সামনে একজন নারী কীভাবে বিবস্ত্র হবে? বিবেকের বিচারে যা সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। তবে বিবেকের এই বিচারকে গুরুত্ব দিলে বা সে অনুযায়ী কাজ করলে অনেক রকম বিশৃংখলা বেড়ে যাবে। এখন একজন অপরিচিত নারী-পুরুষ বিবস্ত্র হচ্ছে। জানা নেই তখন কতো নারী-পুরুষ পরস্পরের সামনে বিবস্ত্র হবে। কেননা একজন নারী বা পুরুষ কতোক্ষণ ধৈর্যধারণ করতে পারবে? নিজেদের কামচাহিদা দমন করে রাখবে? এই পরিণতির দিকে লক্ষ রেখে ইসলামিশরিয়ত বিয়ে অনুমোদন করেছে। যাতে মানুষের চাহিদাপূরণের নির্ধারিত মাধ্যম থাকে। সমাজে বিশৃংখলা ছড়িয়ে না পড়ে। ইসলামিশরিয়ত খোদাপ্রদত্ত-ঐশী হওয়ার প্রমাণ হলো, তার দূরদৃষ্টি সর্বদা পরিণতির দিকে। যে আইন ও নিয়ম মানুষের মেধাপ্রসূত তার দৃষ্টি পরিণতিতে আবদ্ধ থাকে না।

স্বাভাবিকভাবে বিবেক লজ্জাশীল হওয়া কামনা করে। আর বিয়ে নির্লজ্জ বলে মনে হয়। কিন্তু শরিয়ত বিয়ের বিধান প্রণয়ন করেছে লজ্জাকে রক্ষা করতে। কারণ যদি একজায়গায়ও মানুষ লজ্জা পরিহার না করে তবে সমগ্র মানবসভ্যতা নির্লজ্জ হয়ে যাবে।

একাধিক বিবাহ জায়েয হওয়ার রহস্য:

আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষের জন্যে সর্বোচ্চ চারজন মহিলাকে বিবাহ করা জায়েয করেছেন এর অতিরিক্ত চলবে না। কিন্তু শর্ত হলো তার দৈহিক, অর্থনৈতিক ও তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা থাকতে হবে। একাধিক বিবাহের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উপকার। যেমন: লজ্জাস্থানের হেফাজত, যাদের বিবাহ করবে তাদেরকে পূত-পবিত্র রাখা এবং তাদের প্রতি ইহসান করা। এ ছাড়া বংশের বিস্তার লাভ, যার দ্বারা উম্মতের সংখ্যা এবং আল্লাহর ইবাদতকারীদের সংখ্যা বাড়ে। অতএব, যদি ভয় করে যে, তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না তাহলে শুধুমাত্র একজন স্ত্রীকে বিবাহ করবে অথবা দাসী গ্রহণ করবে। আর দাসীর জন্য পৃথক কোন দিন ভাগ করা ওয়াজিব নয়।

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী: "আর যদি ইয়াতিম মেয়েদের ব্যাপারে যথাযথভাবে তাদের অধিকার পূরণ করতে পারবে না এ ভয় কর, তবে সেসব নারীদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে।" [সূরা নিসা: ৩]

২ প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী আল্লাহ একাধিক বিবাহকে যখন হালাল করেছেন তখন অন্য দিকে এটি নিজস্ব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হারাম করে দিয়েছেন। যেমন : দু' বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ ফুফু ও ভাতিজীকে এবং খালা ও ভাগিনীকে; কারণ এর ফলে সৃষ্টি হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও জন্ম নিবে নানা রকমের আপোষে দুশমনি। নিশ্চয় সতীনদের মাঝে ঈর্ষা বড় কঠিন।

বিয়ের ফিকহিবিধান

ওয়াজিব বিয়ে: যখন বিয়ে প্রয়োজন তথা দেহ-মনে তার চাহিদা থাকে এবং তার এই পরিমাণ সামর্থ থাকে যে, প্রতিদিনের খরচ প্রতিদিন উপার্জন করে খেতে পারে, তখন তার জন্য বিয়ে করা ওয়াজিব। বিয়ে থেকে বিরত থাকলে গোনাহগার হবে।

ফরজ বিয়ে: যদি সামর্থ থাকার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা এতো বেশি থাকে যে, বিয়ে না করলে হারামকাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বিয়ে করা ফরজ।

مِنَ الْفِعْلِ الْحَرَامِ النَّظْرُ الْمُحَرَّمُ وَالْإِسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ

"কুদৃষ্টি ও হস্তমৈথুন হারাম কাজের অন্তর্ভুক্ত।"

সুন্নত বিয়ে: যদি বিয়ের চাহিদা না থাকে কিন্তু স্ত্রীর অধিকার আদায়ের সামর্থ্য রাখে তবে বিয়ে করা সুন্নত।

নিষিদ্ধ বিয়ে: যদি কারো আশংকা হয় সে স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারবে না, চাই তা দৈহিক হোক বা আর্থিক তবে তার জন্য বিয়ে করা নিষিদ্ধ।

মতভেদপূর্ণ বিয়ে: যদি চাহিদা ও প্রয়োজন থাকে কিন্তু সামর্থ না থাকে তাহলে

তার বিয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অধমের মতে ওয়াজিবের মতটিই অগ্রগণ্য। সামর্থ কষ্ট-শ্রম ও ঋণ করার দ্বারা অর্জন হয় যদি সে তা আদায় করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা রাখে। আদায়ের চেষ্টাও করে। যদি সে আদায় করতে না পারে তবে আশা করা যায় আল্লাহ তার ঋণদাতাকে রাজি করিয়ে দেবেন। কেননা দীনের সংরক্ষণের জন্য ঋণ করেছিলো। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য ঋণ করা নাজায়েজ। বরং ভরণ-পোষণ ও মহর আদায় করার জন্য যদি তা নগদ প্রদান করতে হয় তাহলে ঋণ করতে পারবে।

বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে করণীয়:

একব্যক্তি আমার কাছে এলো। যার বিয়ের প্রবল চাহিদা ছিলো। কিন্তু এতোটা গরিব ছিলো যে, বিয়ের সামর্থ ছিলো না। সে আমার কাছে নিজের অবস্থা খুলেবলে চিকিৎসা চাইলো। আমি এখনো তার উত্তর দিইনি। আমার বলার আগে তার আলোচনা শুনে তিনি [উপস্থিত একজন] বললেন, 'রোজা রাখো। কেননা হাদিসে এসেছে-

"যে বিয়ের সামর্থ রাখে না তার উচিত রোজা রাখা।"

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

লোকটি উত্তর দিলো, 'আমি রোজা রেখেছিলাম তবুও আমার দেহ-মনের চাহিদা কমেনি।' তার কথা শুনে তিনি আর উত্তর দিতে পারলেন না। আমি তাকে শুনিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কতোদিন রোজা রেখেছিলেন?'

সে বললো, 'দু'টি রোজা রেখেছিলাম।'

আমি বললাম, 'এজন্যই আপনি সফল হতে পারেননি। কেননা বেশি পরিমাণ রোজা রাখা প্রয়োজন ছিলো। একথা সরাসরি হাদিস থেকে প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ الَّى فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء ُ

শব্দটি আবশ্যকের অর্থ প্রদান করে। আর ৮ বা আবশ্যকীয় বিষয় দুই প্রকার। এক. বিশ্বাসগত, দুই. কর্মগত। বাক্যের ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝে আসে এখানে اعتقادی لزومবা বিশ্বাসগত বাক্যের ভাব-ভঙ্গি থেকে বুঝে আসে এখানে اعتقادی لزومবা বিশ্বাসগত আবশ্যকীয় বিষয় উদ্দেশ্য নয়। কর্মগত আবশ্যকীয় কাজ উদ্দেশ্য। কারণ এই

রোজা রাখা ফরজ নয়। বরং রোগের নিরাময়ের জন্য রাখতে বলা হয়েছে। আর যেকাজ কর্মগতভাবে আবশ্যক তা অধিক পরিমাণে বারবার করতে হয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কাজ বারবার করে তখন বুঝতে হবে লোকটি সেই কাজটি নিজের জন্য আবশ্যক

করে নিয়েছে। ফলে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্য-বারবার রোজা রাখো।'

বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, পশুশক্তি [যৌনচাহিদা] দুর্বল করার জন্য অল্পরোজা রাখা যথেষ্ট নয়। অধিক পরিমাণ রোজা রাখালেই সুফল পাওয়া যায়। এজন্য রমজান মাসের শুরুভাগে তা দুর্বল হয় না শেষভাগে কমে যায়। পরীক্ষা করে জানা গেছে, রমজানের শুরুতে পশুশক্তি [যৌনচাহিদা। দমিত হয় না বরং কোষ্ঠ-কাঠিন্য সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা আরো বেড়ে যায়। এরপর ধীরে ধীরে তা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত তা পুরোপুরি দুর্বল হয়ে যায়। তখন পশুশক্তি পরাজিত হয়। কারণ তখন অধিক রোজা রাখা হয়ে যায়।প্রশ্নকারী চলে গেলো। কিন্তু মুজতাহিদ সাহেব যারা সরাসরি শরিয়তের মূল উৎস কোরআন-হাদিস থেকে মাসয়ালা বের করার যোগ্যতা রাখেন, যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিছু বললেন না। পরবর্তীতে তার চিঠি এসেছিলো, 'আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। ওই দরিদ্রব্যক্তির মাধ্যমে তা হয়ে গেছে।

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

পাত্রী নির্বাচন

ইসলাম পরিবার গঠনের জন্য বিবাহকে অত্যাবশ্যকীয় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা তো করেছেই, পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্যও প্রণয়ন করেছে কিছু বিধিনিষেধ এবং নিয়মাবলি। মানুষ যদি ঈমানের সাথে সেগুলো মেনে নিয়ে জীবন গঠন করতে পারে, তাহলে দাম্পত্যজীবন হবে মনকষাকষি-মুক্ত, ভালোবাসা এবং আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, চোখজুড়ানো, মনমাতানো।

প্রতিটি মুসলিম যুবকের মনের গহীন বাসনা হচ্ছে একজন পুণ্যবতী জীবনসঙ্গিনী পাওয়া। যুবক নিজে যদি ফাসেকও হয়, যিনাকারীও হয়, সেও চায় তার স্ত্রী হিজাবী হোক, ধার্মিক হোক, নম্র-ভদ্র হোক। আকাঙ্ক্ষিত সেই সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য ইসলাম প্রণয়ন করেছে অভিনব এক পদ্ধতি। নবী কারীম বলেন-

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَالِحِسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاغْفَرْ بِذَاتِ الدِّين،

'চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়। তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার দৈহিক সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারি। সুতরাং তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।

পাঠক, আমার সাথে সাথে আপনিও একটু ভাবুন। নবী কারীম এ আপনাকে প্রতীক্ষিত জীবনসঙ্গিনী নির্বাচনের পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'তুমি দ্বীনদারিকেই প্রাধান্য দেবে, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'
(বুখারী, হাদীস-ক্রম: ৫০৯০)

আর আল্লাহ তাআলা নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ تُبْدِلَهَ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِتٍ مُّؤْمِنَتٍ قنعت تببَتِ عُبِدَةٍ سَبِحْتٍ ثَيْبَتٍ وَ أَبْكَارًا.

‘যদি নবী তোমাদের সকলকেই পরিত্যাগ করেন তাহলে সম্ভবত তাঁর পালনকর্তা তাঁকে এর পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী। যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামাযী, তওবাকারী, ইবাদাতগোজার, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।’(সূরা তাহরীম:০৫)

আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র আয়াতেও মুমিন স্ত্রীর বিশেষ গুণটির (দ্বীনদারি) কথা উল্লেখ করেছেন, যা স্ত্রীর মধ্যে সবাই চায়। তাহলে সেই বিশেষ গুণটির গ্রহণযোগ্যতা কী পরিমাণ, চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যেটাকে কুরআনে উল্লেখ করেছেন, নবীজি যে গুণের অভাবে সাহাবীদেরকে দিয়েছেন ক্ষতির সতর্কবাণী!' তাই দাম্পত্যজীবনে অনাহূত ক্ষতি থেকে বাঁচতে স্ত্রী নির্বাচনের জন্য সর্বাগ্রে দেখা দরকার সেই বিশেষ গুণটি 'দ্বীনদারি'।

পাত্র নির্বাচন

ইসলাম যেমন কিছু নীতিমালা দিয়েছে, যার মাধ্যমে একজন যুবক তার অর্ধাঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারে; ঠিক তেমনিভাবে কিছু নীতিমালা দিয়েছে, যেগুলোর আলোকে একজন যুবতী তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে পারে। এবার আমরা সেগুলো আলোচনা করব।

এক. দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়া

একজন যুবতীর উচিত পাত্রের মাঝে সর্বাগ্রে যে গুণটি যাচাই করা, তা হলো দ্বীনদারি। দ্বীনদার ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে। তাঁর আদেশ মেনে চলে। তিনি যা করতে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাআলার ভয়ই একজন পুরুষকে স্ত্রীর প্রতি জুলুম-অবিচার এবং স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত রাখবে। সে স্ত্রীকে ভালো না বাসলেও বিরত থাকবে। আর স্ত্রীকে ভালোবাসলে তো কথাই নেই। স্ত্রী যদি বদমেজাযিও হয়, তবুও স্বামী তার প্রতি জুলুম করবে না। বরং বিভিন্ন পন্থায় তাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করে যাবে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধনে সফলতা পাওয়া যায়। কারণ, যে অনুগ্রহ করে, দয়া দেখায়-মানুষ স্বভাবতই তাকে ভালোবাসে ও তার অনুগত থাকে।

রাসূল পাত্রীর অভিভাবকদেরকে উপদেশ দিয়ে গেছেন যাতে পাত্রের দ্বীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা হয়। পারিবারিক দায়িত্ব পালন, স্ত্রীর অধিকার আদায়, সন্তান প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে ছেলেটি আস্থাভাজন কি না। আত্মমর্যাদাবোধ, ব্যবহার-আচার, দ্বীনের বিধানাদি মান্য করা এবং পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে প্রতিশ্রুতিশীল কি না। আর এমন দ্বীনদার ও চরিত্রবান পাত্রের প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ব্যাপারে নবী কারীম সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيض

'যখন তোমাদের কাছে এমন বাজির প্রস্তাব আসে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারি তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তোমরা তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও অন্য কোনো কারণে তাকে ফিরিয়ে দিয়ো না)। বিপরীতটা যদি করো তাহলে পথিবীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে।
(ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম: ১৯৬৭, অধ্যায়: বিবাহ)

এই হলো সর্বোত্তম স্বামী, যাকে নবী কারীম এ আপনার জন্য পছন্দ করেছেন। সর্বাগ্রে তাকে হতে হবে দ্বীনদার ও চরিত্রবান। এ-কারণেই নবী কারীম বলেছেন, 'তাহলে তাড়াতাড়ি তার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।' এখানে আরবী ভাষ্যে 'ফা' অব্যয়টি এসেছে সাথেসাথেই ও তাড়াতাড়ি বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ দ্রুত তার প্রস্তাব গ্রহণ করো। এবং খুব শিগগিরই তা বাস্তবায়ন করে ফেলো। কারণ, এ যুগে এ ধরনের মানুষ পাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি আল্লাহ তাআলা আপনার কাছে দ্বীনদার ও চরিত্রবান কোনো ছেলেকে উপস্থিত করেন, তাহলে আপনি বুঝে নেবেন মহান রব আপনার কল্যাণের ফায়সালা করেছেন। কারণ, দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছেলে আপনার হাত ধরে আপনাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে নিয়ে যাবে। আর তার কারণেই আপনি জান্নাতে তার স্ত্রী হবেন। এজন্যই নবী কারীম হাদীসের শেষ অংশে বলেছেন, 'যদি তোমরা বিপরীত কিছু করো তাহলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে।'

একজন মুমিনা যুবতী মেয়ে একটা দায়িত্বহীন মন্দচরিত্রের ছেলের অধীনে থাকবে-একজন নারী ও তার সন্তানের জন্য এরচেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে! আপনার আশপাশেই তাকান, দ্বীনদারি ছাড়া আর সবকিছুকেই প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে পাত্র দেখার ক্ষেত্রে। পিতার ঘরদোর-সম্পদ দেখে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে মাদকাসক্তের সাথে। সরকারি উচ্চপদ দেখে মেয়ে দিচ্ছে দুর্নীতিবাজ চোরের কাছে। কেবল দ্বীনদারির কোনো মূল্য নেই, বাকি অর্থ-বিত্ত-চাকরি-পিতা-সবকিছুর মূল্য দেয়া হচ্ছে, মাঝখান থেকে সর্বনাশ হচ্ছে মেয়েগুলোর। এইসব দুনিয়াদার ছেলে মেয়েটির প্রতি অনুগ্রহ করছে না, যৌতুকের জন্য চাপ দিচ্ছে, পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে, মেয়ের গায়ে হাত তুলছে। যার কাছে আল্লাহ আর রাসূলের কোনো মূল্য নেই, তার কাছে একটা মেয়ের কী মূল্য! দুনিয়ার ভোগের পেছনে যে আল্লাহ-রাসূলের হুকুমকে পদদলিত করে, সে তো আপনাকেও পদদলিত করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। নিজের নিরাপত্তার জন্যই দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৩০-৪০ বছর একসাথে আপনি কাটাবেন, এই পুরো ৩০-৪০ বছরাই ভালোবাসা একই রকম থাকে না। দুনিয়ার স্বার্থ, ভোগের লোভ, দারিদ্র্যে-নষ্ট স্বভাব এসে ভালোবাসাকে ঢেকে ফেলে। আপনাকে সেই আশঙ্কার কথাও মাথায় রাখতে হবে, যদি ভালোবাসা না জন্মে, বা শুরুর উদ্দাম প্রেম যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন ছেলেটি কি আপনাকে ছুঁড়ে ফেলবে, জুলুম করবে, কষ্ট দেবে। নাকি আপনার দৈহিক হক, মানসিক হক, আর্থিক হক আদায় করতে থাকবে। কেবল দ্বীন ও আল্লাহ-ভীতি যার মধ্যে আছে, সে এমন অবস্থায়ও আপনাকে নিয়ে ইজ্জতের

সাথে সহাবস্থান করবে। 'অভাব যখন দরজা দিয়ে আসে, ভালোবাসা তখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়'- কথাটা সত্যি, কিন্তু এটা বেদ্বীনদের সংসারের কথা। আইয়ুব-রাহিমাহ'র সংসার ভাঙেনি, খাদীজাহ-মুহাম্মদের সংসারে জানালা দিয়ে পালায়নি, ফাতিমাহ-আলী'র সংসারে সুখ কমেনি। আলাইহিমুস সালাম আজমাঈন। এজন্য দ্বীনের প্রতি ও সুন্নাতের প্রতি মহব্বতের সকল চিহ্নকে প্রাধান্য দিন। লেবাস-সুরত থেকে নিয়ে নফল আমলের খোঁজ নিন। কুরআনের সাথে কেমন সম্পর্ক বুঝে নিন। ইলমের স্তর ও ইলমের আগ্রহ জেনে নিন। দুনিয়াপরস্তি, লৌকিকতা, অর্থের নেশা, জীবনের উদ্দেশ্য-এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করুন যেদিন আপনাকে দেখতে আসবে। লজ্জায় চুপ থাকলে নিজেই ঠকবেন।
আর একজন পুণ্যবতী নারীর এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে যে, সে একটা ফাসিক স্বেচ্ছাচারী স্বামীর আওতায় থাকবে। সে তাকে বন্ধুদের পার্টিতে যেতে জোর করবে। তাদের সামনে বেপর্দা হতে বাধ্য করবে। মিলনের সময় বিকৃত রুচি চরিতার্থ করতে বাধ্য করবে। হায় আফসোস! কত যুবতী মেয়ে পিতার অধীনে পবিত্রতা ও দ্বীন রক্ষা করে চলে। কিন্তু যখন দ্বীনবিমুখ স্বেচ্ছাচারী স্বামীর ঘরে চলে আসে, তখন সেও হয়ে যায় আত্মমর্যাদাহীন, মন্দ স্বভাবের একজন নারী। আল্লাহ-রাসূলের কোনো মূল্যায়ন তার কাছে থাকে না। আত্মমর্যাদা ও পবিত্রতার বিষয়ে থাকে না তার কোনো ভ্রুক্ষেপ।

ছেলের পরিবারের খবর নিন। দ্বীনবিমুখ স্বেচ্ছাচার পরিবারের মাঝে যে সন্তানগুলো বেড়ে উঠবে, তেমন ফাসেকী মনোভাব নিয়েই বেড়ে উঠবে। বিশৃঙ্খলা ও পাপাচারকে স্বাভাবিক জেনেই তারা বড় হবে। তবে বহু ছেলে এমন পরিবারে জন্মেও সংগ্রামের সাথে দ্বীনের উপর টিকে আছে। পরিবার এমন-তেমন দেখলেও পাত্রের দ্বীনমুখিতা বুঝে সম্বন্ধ গ্রহণ করা যায়। তাদের দ্বারা হিদায়াত ও সৎকর্মের আশা করা যায়।

সচ্চরিত্র 'দ্বীন'-এরই অংশ হওয়া সত্ত্বেও নবী কারীম এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে থাকার জন্য সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং দ্বীনদারির মজবুতি ও দুর্বলতা সচ্চরিত্রের উপর নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে খুব বেশি ইবাদাত-বন্দেগী করে কিন্তু স্বভাবচরিত্রের বেলায় তার ফলাফল শূন্য। এমন হলে সেটা তার প্রকৃত দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দ্বীনদারির দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

নবী কারীম বলেন-

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

'সর্বোত্তম চরিত্র গঠনের জন্য আমাকে নবী করে পাঠানো হয়েছে।''(মুসতাদরাকু হাকিম- ২/৬৭০ [৪২২১])

অন্য বর্ণনায় আছে-

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلَاقِ

'সচ্চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে’
(ইমাম বুখারী-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস-ক্রম: ২৭৩; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম: ৮৯৫২)

কারণ, নবী কারীম আবু জাহাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এক নারীকে বলেছিলেন-

أما أبو الجهم فلا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ، إِنْكِيْ أُسَامَةَ

আর আবু জাহান তো তার কাঁধ থেকে লাঠি নামায়ই না। তুমি বরং উসামাকে বিয়ে করো। ([] মুসলিম, হাদীস-ক্রম: ১৪৮০, অধ্যায়: তালাক)

পাত্রের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তার ক্যাম্পাস ও প্রতিবেশীদের থেকে খবর নেয়া যেতে পারে। গুণ্ডামি-রঙবাজির ইতিহাস থাকলে তা গ্রাহ্য করা উচিত হবে না।

সাম্প্রতিককালে আমরা অনেককেই দেখি, যদি তার মেয়েকে কোনো যুবক বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে সে যুবককে চরিত্র ও দ্বীনদারির ছাঁচে মাপে না। সে বর্বরতার যুগের ভোগবাদী সংস্কৃতির ছাঁচে মাপতে থাকে; যে সংস্কৃতিতে যুবকের দ্বীনদারি ও আচার-ব্যবহারের কোনো জায়গা নেই। কেবল ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তিকেই গোণায় ধরে। এ কারণেই শুধু উচ্চবিত্ত ও বংশীয় প্রভাবশালীদের হাতেই মেয়েকে পাত্রস্থ করে। যদিও সে ফাসিক বা মন্দ স্বভাবের হোক।

সাহাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম-আচার-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলো?" উপস্থিত লোকেরা বললেন, "সম্ভ্রান্ত লোক। সে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে। সে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সে যদি কথা বলে তাহলে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে।"" সাহাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তারপর রাসূল চুপ করে থাকলেন। কিছুক্ষণ

পর এক মুসলিম দরিদ্রলোক নবীজির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নবীজি বললেন, "তোমরা এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলো?" উপস্থিত লোকেরা বললেন, "সাধারণ মানুষ। সে যদি বিয়ের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে না। সে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। সে কথা বললে তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা হবে না।" "তখন নবী কারীম এ বললেন, "প্রথম ব্যক্তির মতো মানুষ দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে এই সাধারণ ব্যক্তি উত্তম।"
(বুখারী, হাদীস-ক্রম: ৫০৯১, অধ্যায়: বিবাহ)

জুলাইবীব এ-এর ঘটনা

প্রিয় ভাই-বোনেরা, সুন্নত হলো বিবাহের কাজটাকে সহজ করা, এটাকে জটিল করে না তোলা। একই সঙ্গে এটাও সুন্নত, যে, দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রবান ছেলের কাছে বিয়ে দেবেন। যদিও সে অর্থ-কড়ির দিক দিয়ে গরীব। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ঈমান থাকে, সেটিই একজন বিচক্ষণ মুমিনকে এরকম ছেলের সাথে বিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করবে। চাই ছেলেটি বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে সুশ্রী না হোক।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "নবী কারীম এই-এর একজন সাহাবী ছিলেন জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু। দেখতে শুনতে ভালো ছিলেন না। নবী কারীম তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। তিনি বললেন, "আপনি আমাকে রিক্তহস্তই পাবেন।" নবী কারীম বললেন, "কিন্তু তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে রিক্তহস্ত নও।" (মুসনাদু আবী ইয়ালা-৬/৮৯ [৩৩৪৩])

এই সম্মানিত সাহাবী-জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিয়ের ব্যাপারে নবী কারীম এস্ট্র নিজে চেষ্টা-তদবীর করেছেন। আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত, কীভাবে তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে এগিয়ে আসতেন। কীভাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করতেন। কীভাবে অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করতেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যেন আমরা মানুষের কাছে আমাদের মুসলিম ভাইদের বিয়ের জন্য সুপারিশ করি।

আবু বারযাহ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জুলাইবীব ছিলেন আনসারদের একজন। নবী কারীম-এর সাহাবীদের কারো কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়ে থাকলে তিনি নবীজিকে জানাতেন। তাঁর ব্যাপারে নবীজির নিজের কোনো প্রয়োজন আছে কি না।

একদিন নবী কারীম জনৈক আনসারী সাহাবীকে বললেন, 'তোমার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও।' তিনি বললেন, 'কতই না চমৎকার কথা! এটা তো সর্বোত্তম নিয়ামত।' নবীজি বললেন, 'আমি নিজের জন্য চাচ্ছি না।' সাহাবী বললেন, 'তাহলে কার জন্য?' নবীজি বললেন, 'জলাইবীবের জন্য।' সাহাবী তখন নিবেদন করলেন, 'আল্লাহর রাসূল, আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করে দেখি।'

তিনি মেয়ের মায়ের কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসূল তোমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন।' শুনে মা বললেন, 'চমৎকার। এটা তো সর্বোত্তম নিয়ামত। নবীজির সাথে তার বিয়ে দিয়ে দাও।' সাহাবী বললেন, 'নবীজি নিজের জন্য প্রস্তাব দেননি।'

'তাহলে কার জন্য?'

'জুলাইবীবের জন্য।'

'জুলাইবীবের জন্য! না, আল্লাহর শপথ! জুলাইবীবের সাথে মেয়ে বিয়ে দেব না।'

মায়ের মতামত জেনে মেয়ের বাবা যখন নবী কারীম-এর কাছে আসতে উদ্যত হলেন, তখন ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে বাবা-মাকে লক্ষ করে বললেন, 'আপনাদের কাছে কে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন?' তাঁরা বললেন, 'নবী কারীম এ।' মেয়ে বললেন, 'আপনারা কার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছেন, ভেবে দেখেছেন? আমাকে নবীজির হাতে তুলে দিন, তিনি আমার প্রতি অবিচার করবেন না।'

কন্যার বাবা নবী কারীম এস্ট্র-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'তার ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। আপনি তাকে জুলাইবীবের সাথে বিয়ে দিতে পারেন।'

অতঃপর নবীজি তাকে জুলাইবীবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলেন।

একবার নবীজি একটি যুদ্ধে ছিলেন। তিনি বললেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে হারিয়ে ফেলেছি।' একটু পর তিনি আবার বললেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' সাহাবীরা বললেন, 'আমরা অমুক অমুককে হারিয়ে ফেলেছি।'

কিছুক্ষণ পর নবীজি আবার বললেন, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না?' সাহাবীরা বললেন, 'না।' তিনি বললেন, 'আমি কিন্তু জুলাইবীবকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা তাকে নিহতদের মাঝে খোঁজো।' সাহাবীরা খুঁজে তাঁকে সাতজন নিহত ব্যক্তির পাশে পেলেন। তিনি তাদেরকে হত্যা করে নিজে শহীদ হয়েছেন। নবীজি এই বললেন, 'সে আমার অংশ, আমি তার অংশ। সে সাতজনকে হত্যা করেছে, পরে শত্রুরা তাকে হত্যা করেছে? সে আমার অংশ আমি তার অংশ।সে সাতজনকে হত্যা করেছে, পরে শত্রু তাঁকে হত্যা করেছে? সে আমার অংশ আমি তার অংশ।' নবীজি তাঁকে আপন দুই বাহুতে উঠিয়ে নিলেন। যতক্ষণ সাহাবীরা তাঁর জন্য কবর খনন করছিলেন, তাঁর খাটিয়া ছিল নবীজির দুই বাহু। অতঃপর স্বহস্তে তিনি তাঁকে কবরে রাখলেন।
(ইবনু হিববান-৯/৩৪২-৩৪৫ [৪০৩৫])

তাহলে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি আমাদের কাছে দ্বীনদার ও সচ্চরিত্রবান প্রমাণিত হবে, আমরা তার সাথে কন্যা বিয়ে দেব। এবং আমরা তার জন্য মানুষের কাছে যাব, যেন তারা তার সাথে বিয়ে দেয়। তার দারিদ্র্য, চেহারার কমতি, সম্ভ্রান্ততা ও বংশীয় মর্যাদার অভাব আমাদেরকে যেন এ কাজে বাধা না দেয়।

তাই মূর্খতার যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতি ঝেড়ে ইসলামী পরিবার গঠনের জন্য যত্নসহকারে চেষ্টা করুন। একজন পুণ্যবতী নারী ও পুণ্যবান পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হয় একটি ইসলামী পরিবার।

মুসলিম যুবতীর অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ছোট্ট একটি কথা

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম একজন নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে; যাতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কটা ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যুবতী মেয়ের এই অধিকার বাস্তবায়ন করা জরুরি। বুঝবান মেয়ে শুধু ঠুনকো সম্পর্কের কারণে বিয়ের প্রস্তাব মেনে নেবে না। ছেলের সৌন্দর্য-পদ-সম্পদের কারণে ধোঁকা খাবে না।

তাই একজন যুবতীকে সৎ, চরিত্রবান, আচার-ব্যবহারে মার্জিত-ভদ্র, হালাল-হারান বেছে জীবনযাপনকারী এবং কর্মঠ স্বামী নির্বাচন করতে হবে। এই গুণগুলো হয়তো বাড়ে-কমে, কিন্তু একদম মিটে যায় না। গুণপনা হৃদয়ে সৃষ্টি করে অকৃত্রিম ভালোবাসা। পরিবারে আসে স্থায়ী সুখ-শান্তি।

কবির কথা বড়ই চমৎকার। 'কদাকার অন্তর নিয়ে সৌষ্ঠব চেহারার অধিকারী হওয়া-অগ্নিপূজকের কবরের উপর প্রদীপ জ্বালানোর নামান্তর'।

বর্ণিত আছে, এক আরব নারীকে জনৈক যুবক বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই যুবকের সৌন্দর্য নারীকে অত্যধিক আকর্ষণ করেছিল বলে চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের প্রতি মেয়েটি খেয়াল করেনি। তার বাবা অবশ্য তাকে যুবকের চারিত্রিক দোষত্রুটির কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে পাত্তা দেয়নি। বাবা মেয়েকে এই বিয়ে না করার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন। কাজ হলো না, মেয়েটি সেই চারিত্রিক দোষত্রুটির কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে পাত্তা দেয়নি। বাবা মেয়েকে এই বিয়ে না করার উপর চাপ প্রয়োগ করলেন। কাজ হলো না, মেয়েটি সেই যুবককেই বিয়ে করল।

বিয়ের এক মাস পর বাবা এলেন মেয়েকে দেখতে। মেয়ের শরীরে স্বামীর নির্যাতনের ছাপ দেখতে পেলেন। না দেখার ভান করে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রিয় বেটি, কেমন আছ?' মেয়েটি ভালো থাকার কথা বলল। তখন বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শরীরে আঘাতের দাগ কেন?' মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আব্বাজান, আপনাকে আমি আর কীই-বা বলব!'

দুই. পাত্র কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম জনৈক সাহাবীকে কুরআনের জ্ঞান থাকার কারণে বিয়ে করিয়ে দিয়েছিলেন।।"

(বুখারী, হাদীস-ক্রম: ৫১৪৯, অধ্যায় বিবাহ) সুতরাং যাচাই করতে হবে তার ভেতরে কুরআন কতটুকু আছে। কুরআন আছে মানে হিফজ না কেবল, কুরআন থাকা মানে কুরআনের ভালোবাসা থাকা, কুরআনের সাথে সম্পর্ক থাকা। যে কুরআনকে ভালোবাসে, তাকে এই ভালোবাসাই টেনে নেয়। এই ভালোবাসার কারণেই সে কিছু কিছু মুখস্থ না করে পারে না। এই ভালোবাসার কারণেই সে এর অর্থ জানার চেষ্টা বাকি রাখে না। তাফসীর, হাদীস ইত্যাদি কতটুকু পড়েছে, প্রিয় কিতাব কী কী, অতি পরিচিত কিছু আয়াতের তাফসীর, প্রতিদিন তিলাওয়াতের অভ্যাস আছে কি না, নফল আমলের সাথে কেমন সম্পর্ক ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তার মেজায-মানহাজ-ধারণা আইডিয়া করে নিতে পারেন।

তিন. ছেলে স্ত্রীসহবাস ও বৈবাহিক খরচ বহনে সক্ষম হওয়া

নবী কারীম যুবকদেরকে স্ত্রীসহবাস ও বৈবাহিক খরচ বহনের সক্ষমতা-সহ বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ফাতিমা বিনতু কায়িস রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন, '.. আর মুয়াবিয়া তো হতদরিদ্র, তার কোনো ধন-সম্পদ নেই। এস এগুলো মেয়ের ভাই বা বাবা জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। কোনো শারীরিক সমস্যা আছে কি না, একটানা কোনো ওষুধ খায় কি না। ডাক্তারি মতে, পুরুষ যদি মাঝে মাঝে সকালে ঘুম ভেঙে লিঙ্গ শক্ত পায় , তাহলেই সে শারীরিকভাবে সক্ষম। লজ্জা না করে এসব পাত্রীপক্ষ থেকে মুরব্বী গোছের কেউ জেনে নিতে পারেন। কেননা বিবাহের উদ্দেশ্যই হালালভাবে স্বভাবজাত চাহিদা পূর্ণ করা। মূল উদ্দেশ্যই অপূর্ণ রয়ে গেলে তা উভয়ের জন্যই ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

চার. ছেলেটি মেয়ের উপযুক্ত হওয়া বা কুফু

এ উপযুক্ততার কারণ হলো, যাতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবাধ্যতা সষ্টি না হয়।আল্লাহ তাআলা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

'পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ-জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। '(মুসলিম, হাদীস-ক্রম: ১৪৮০)

তাহলে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব দুটো জিনিসের মাধ্যমে সম্ভব।

এক. স্বভাবগত বিষয়। অর্থাৎ ভেতরগত বিষয়। সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহ যার মাধ্যমে পুরুষদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কর্তৃত্বের সকল স্বভাব পুরুষের মধ্যে দেয়া আছে, আর আনুগত্যের সকল স্বভাব নারীর মধ্যে নিহিত আছে। একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য-থেকে বুঝা যায় 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটি সুন্দরভাবে চলতে পুরুষটির বৈশিষ্ট্য নারীর উপর বেশি হওয়া চাই। যদি আসলেই পরিবারে শান্তি চান তবে 'সৌন্দর্য ছাড়া' বাকি দুনিয়াবি বিষয়গুলো-যেমন ধনসম্পদ, আভিজাত্য, শিক্ষাগত ডিগ্রি (জেনারেল/দ্বীনী)-যেন 'আপনার থেকে বেশি' হয়। কেবল স্বামীর রূপ যেন আপনার থেকে বেশি না হয়। পরে সমস্যা হতে দেখেছি। আরে, 'তুই তো আরও সুন্দরী মেয়ে পেতি'-এ-জাতীয় কথা স্বামীর মনে জমতে থাকবে আশপাশ থেকে, ভালোবাসা কমবে। বাকি বৈশিষ্ট্যগুলোতে স্বামী যেন আপনার চেয়ে বেশি থাকে। যদি কোনো ডাক্তার মেয়ে সেই হাসপাতালের কোনো পরিচ্ছন্নতাকর্মীকে বিয়ে করে; নিঃসন্দেহে এটা বৈধ, এর অনুমতি আছে, কিন্তু এ ধরনের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘৃণা, অবাধ্যতা, আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেতে থাকবে। সংসার টিকবে না, বা ধুকে ধুঁকে টিকবে।

দুই, বহিরাগত বিষয়। সেটি হচ্ছে অর্থ ব্যয় করা। চাই সেটি দেনমোহরের ক্ষেত্রে হোক কিংবা সাংসারিক খরচ বাবদ। তাহলে এই দুটো জিনিসের মাধ্যমে পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরিবারে পূর্ণতা পায়। যদি দুটোর একটির মাঝে কমতি থাকে তাহলে কর্তৃত্বের বেলায় কমতি হবে। এখনকার যুগে যেটা হচ্ছে, নারী যদি সাংসারিক খরচ বাবদ নিজের অর্থ ব্যয় করে তাহলে নিঃসন্দেহে তারও কর্তৃত্বের একটি দাবি থাকে; সংসারে যার প্রভাব ফুটে ওঠে।

যদি রানি হতে চান, তাকে রাজা বানান, রাজা মনে করুন, রাজার মতো ট্রিট করুন। নিজেকে কোনো অবস্থাতেই স্বামীর প্রতিপক্ষ বানাবেন না। কোনো অবস্থাতেই নিজেকে স্বামীর চেয়ে 'সুপিরিয়র' বা শ্রেষ্ঠ প্রমাণের চেষ্টা করবেন না, যদি সংসার সুখের চান। যদি স্বামী-সোহাগিনী হতে চান, আপনার যোগ্যতা স্বামীর চেয়ে বেশি হলেও নিজেকে ছোট বানিয়ে রাখুন তার সামনে।

বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে 'কুফু' অন্যতম। আরবী 'কুফু' শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য ইত্যাদি। বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে 'কুফু' অন্যতম। আরবী 'কুফু' শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য ইত্যাদি।

বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের রুচি, চাহিদা, বংশ, যোগ্যতা-ইত্যাদি সমান সমান বা কাছাকাছি হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় কুফু বলে। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের রুচি, চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থান খুব বেশি ভিন্ন হলে সেখানে সুখী দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। একজন এলিট শ্রেণির ছেলেমেয়ের চাহিদা-রুচির সঙ্গে একজন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের রুচিবোধের মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক। আবার একজন দ্বীনদার পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একজন ধর্ম বিষয়ে উদাসীন পাত্র-পাত্রীর জীবনাচার নাও মিলতে পারে। দ্বীনদার চাইবে সবকিছুতে ধর্মের ছাপ থাকুক। আর দ্বীনহীন চাইবে সবকিছু ধর্মের আবরণমুক্ত থাকুক। সুতরাং এ দুইয়ের একত্রে বসবাস কখনো শান্তি-সুখের ঠিকানা হতে পারে না।রাসূলুল্লাহ ঐ বলেছেন-

تَخَيَّرُوا لِنَطْفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

'তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম নারী গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবেচনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ রাখো।'(ইবনু মাজাহ, হাদীস-ক্রম: ১৯৬৮, অধ্যায়: বিবাহ)

কুফু বা সমতা রক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে ইসলামী আইন-শাস্ত্রের চার ধারার ফকীহগণ একমত। তবে সমতার বিষয়গুলো কী হবে তা নির্ধারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য আছে। হানাফী ফকীহদের মতে যেসব বিষয়ে সমতা রক্ষা করতে হবে তা হলো-ধর্ম, বংশ,

স্বাধীনতা, দ্বীনদারি, পেশা ও সম্পদ। কোনো নারী যদি কুফুর প্রতি লক্ষ না রেখে বিবাহ করে তবে তার অভিভাবকের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে।

আল্লামা আবদুল গনী দিমাশকী হানাফী বলেছেন, 'বিবাহে সমতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং যদি কোনো নারী এমন কাউকে বিবাহ করে, যার সাথে তার কুফুর মিল নেই, তাহলে দুই জনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার অধিকার রয়েছে অভিভাবকের।'(রদ্দুল মুহতার-৩/৮৪ মাক)

কুফু'র বিষয়টা কেবল মেয়ের দিকে লক্ষণীয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি বিচার্য নয়। অর্থাৎ ছেলেকে মেয়ের সাথে সমতা রক্ষাকারী (মেয়ের উপযুক্ত) হতে হবে। যদি মেয়ে ছেলের সমপর্যায়ের না হয় (ছেলের চেয়ে যোগ্যতায় কম হয়), তাহলে কোনো সমস্যা নেই।

পাঁচ. এমন ছেলে নির্বাচন করা যে তাকে সতীসাধ্বী রাখবে ও দ্বীনদারি হেফাজত করবে-

অধিক বয়স্ক পুরুষ বিয়ে করা অবৈধ নয়, তবুও অপছন্দনীয়। বিষয়টি হচ্ছে-অল্প বয়সের কোনো যুবতী মেয়েকে ৮০ বছরের দুর্বল বৃদ্ধের সাথে বিয়ে দিলে তা একদিক থেকে অনুচিত। কারণ এই বৃদ্ধ তাকে সতীসাধ্বী রাখতে পারবে না,চাহিদা পূরণে যুবকের মতো হতে পারবে না। তার যৌনাঙ্গের যথাযথ মূল্যায়ন সে করতে পারবে না। আমাদের সামনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ঘটনাটি রয়েছে। নবীজি এ বলেছিলেন, 'সে তো ছোট।' পরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব দেন এবং তাঁর সাথেই বিয়ে হয়। (নাসায়ী, হাদীস-ক্রম: ৩২২১, অধ্যায়: বিবাহ। সনদ সহীহ)

তবে এই বিষয়টি সব বৃদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনেক বৃদ্ধ আছেন যাঁরা যুবকদের মতো সামর্থ্যবান, অনেক যুবকও তেমন সামর্থ্য আজকাল রাখে না।

ছয়. শারীরিক দোষত্রুটি-মুক্ত ছেলে নির্বাচন করা

প্রথম অধ্যায়ে ১২ নম্বর পয়েন্টে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

নবী কারীম বলেছেন-

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ

'সিংহ থেকে পলায়ন করার মতো কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো।(মুসনাদু আহমাদ, হাদীস-ক্রম। ১৭২২)

বিবাহের আগেই পাত্র-পাত্রীর জন্মগত ত্রুটি থাকলে বা কোনো বড় অসুখ থাকলে তা উভয়পক্ষেরই জানার অধিকার রয়েছে, যাতে পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে কোনো জটিলতা না হয়। কোনো পক্ষই যেন নিজেকে প্রতারিত মনে না করে। অনেক সময় দেখা যায়, বিচ্ছেদ না হলেও মনে অশান্তি নিয়ে, নিজেকে প্রতারিত ভেবে জীবন কাটাতে হয়, যা কাম্য নয়।

সাত. ছেলে সত্যবাদী ও আমানতদার হওয়া-

মাদইয়ান অধিবাসী জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি (শুয়াইব আলাইহিস সালাম)-এর মেয়ের পরামর্শ আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন-

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

'নিশ্চয় আপনি যাকে কাজে রাখবেন, তার মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই সর্বোত্তম।'
(দূর কাসাস, আয়াত-ক্রম: ২৬)

মেয়েটি এ-কথা বলার দ্বারা মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন।

তাহলে পুণ্যবান স্বামীর এটিও একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে, সে হবে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। বরং নবীজি প্লট-এর সাথে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র বিয়ে হয়েছিল নবীজি সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আম্মাজান খাদীজা নবীজির আমানতদারিতার পরিচয় পেয়েছিলেন।

পাত্রের চাকুরি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সহকর্মী-কর্মচারীদের কাছে খোঁজ নিলে এ ব্যাপারে জানা সম্ভব।

আট. ছেলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়া

সম্ভ্রান্ত বংশ বলতে কী বুঝানো হয়, সেটা শুরুর দিকে আলোচনা হয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্বভাব-চরিত্রের কথা সর্বত্রই লোকমুখে প্রসিদ্ধ থাকে। এ-কারণেই যখন আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মু সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন উম্মু সুলাইম বলেছিলেন, 'তোমার মতো ব্যক্তির প্রস্তাব নাকচ করা যায় না।' সে-সময় আবু তালহা মুসলিম না হওয়া সত্ত্বেও সর্বোত্তম চরিত্রবান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।
(নাসায়ী, হাদীস-ক্রম: ৩৩৪১, অধ্যায় বিবাহ)

অনুরূপ নবীজি যখন আম্মাজান উম্মু হাবীবাহ রামলাহ বিনতু আবি সুফিয়ানকে বিয়ে করেছিলেন; এবং তাঁর বাবা (আবু সুফিয়ান) বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি তখন কাফির হওয়া সত্ত্বেও বলেছিলেন, 'লোকটি ভালো।'

নয়. পাত্রের অর্থোপার্জন হালাল হওয়া

পাত্রের উপার্জন হালাল কি না যাচাই করা খুব জরুরি। হারাম অর্থ বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মাঝে দুআ কবুল হওয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, নবীজি এট বলেছেন, 'জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে। উসকোখুসকো চুলে ধূলিমলিন চেহারা নিয়ে দুহাত আসমানের দিকে সম্প্রসারিত করে বলে, "আল্লাহ, হে আল্লাহ।" অথচ তার খাদ্য হারাম। তার
পানীয় হারাম। তার পরিধেয় বস্ত্র হারাম। তার চতুষ্পদ প্রাণীটিও হারাম। তাহলে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে!''(মুসলিম, হাদীস-ক্রম: ১০১৫, অধ্যায়: যাকাত)

আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক বলেন, 'সন্দেহের কারণে একটি দিরহাম ছেড়ে দেওয়া আমার কাছে এক লক্ষ টাকা দান করা থেকে উত্তম।' এভাবে তিনি ছয় লক্ষ পর্যন্ত গুণলেন।
(ইবনু আবিদ দুনিয়া-কিতাবুল ওয়ারা'-২০৬)

উহাইব ইবনুল ওয়ারদ বলেন, 'যদি তুমি স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে (ইবাদাত করতে) থাকো তাহলেও তোমার কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটি লক্ষ না করবে যে, তোমার পেটে হালাল প্রবেশ করল নাকি হারাম।'
(ইবনু আবিদ দুনিয়া-কিতাবুল ওয়ারা-১২৩)

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'যে ব্যক্তির পেটে হারাম খাদ্য রয়েছে,সে হারাম থেকে তাওবা না করা অবধি আল্লাহ তাআলা তার নামায কবুল করবেন না।'
(ইমাম যাহাবী-কিতাবুল কাবাইর-১২০)

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা হালালের নয়-দশমাংশই ছেড়ে দিতাম হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে (সাবধানতাবশত)।
(ইমাম যাহাবী-কিতাবুল কাবাইর-১২০)

স্পষ্ট হারাম রোজগার প্রমাণ করে পাত্রের হয় দ্বীনী জ্ঞানের স্বল্পতা, নয়তো দ্বীনকে পাত্তা না দেয়া, বা দুনিয়ার লোভ। সুদি ব্যাংকে চাকরি, সুদ নিয়ে ব্যবসা, মানব-রচিত হারাম আইন প্র্যাক্টিস, হারাম আইন অনুসারে বিচারক, নাটক-সিনেমা-মডেলিং, হারাম পণ্যের ব্যবসা (ডিশ, মাদক, দালালি), কুফরের রক্ষক ও কুফরী নীতিমালা বাস্তবায়নকারী বাহিনী বা ক্যাডারের চাকরিতে রত পাত্রের সাথে স্রেফ দুনিয়াবি স্বার্থে মেয়েকে বিবাহ দেয়া বা বিবাহ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

দশ. ছেলে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া

জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এখানে উন্মাদের বিপরীত জ্ঞানী হওয়া উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, আচার-ব্যবহারে পারঙ্গমতা। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গভীর পর্যবেক্ষণ করা। বিভিন্ন বিষয় ও কাজকর্মে নিবিড় দক্ষতা অর্জিত হওয়া। মন্দ কাজের প্রতিকার সম্পর্কে দক্ষ হওয়া। রাগকে দমন করার মতো সহনশীলতা থাকা। অনাচার-অবিচার প্রতিহত করার মতো ন্যায়বিচার থাকা। মানবিক নানারকম বিষয়ের প্রতি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকা। এই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিই আপনার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত।

এগারো. ছেলে আলিম কিংবা ইলমের প্রতি আগ্রহী হওয়া

মূর্খতা যে-কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই নিন্দনীয়। যে স্বামী সুখ-শান্তির পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, সে তার জীবনসঙ্গিনীকে বৈবাহিক সুখ-শান্তি উপহার দিতে পারবে না। মাদরাসাপড়ুয়াই হতে হবে জরুরি না, ইলনের আগ্রহ রাখে, ইলমের কদর করে, আলিমদের সংস্পর্শে ওতপ্রোতভাবে থাকে-এমন প্রত্যেকেই তালিবুল ইলম।

আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কুমাইল ইবনু যিয়াদকে বলেন, 'আমি তোমাকে যা বলি মুখস্থ করে রাখো। মানুষ তিন ধরনের হয়-আল্লাহওয়ালা আলিম, হিদায়াত-প্রত্যাশী, এবং নিকৃষ্ট স্বভাবের।

'নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষ সব ধরনের আহ্বানকারীর পিছেই ছুটে। বাতাস যেদিকে বয়ে যায় তারাও সেদিকে চলে। তারা ইলমের আলোয় আলোকিত হয় না, কোনো শক্তিশালী ভিত্তির কাছে আশ্রয়ও নেয় না।'
(ইবনুল আসাকির-তারীখু মাদীনাতি দিমাশক-৫০/২৫২)

তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে-স্বামী বিদ্যার্জন ও দ্বীনী দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকবে। এবং স্ত্রীকেও এ কাজে লিপ্ত রাখবে। দ্বীনের দাওয়াতই তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য, পরিবারের ভিত।
ইলমের প্রতি আগ্রহ আছে কি না, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আঁচ করা যেতে পারে।

বারো, ছেলে পিতামাতার প্রতি সদাচারী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হওয়া

যে ব্যক্তি তার পিতামাতার অবাধ্য হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকতে পারে না। এ ধরনের যুবক একজন মুমিন নারীর জন্য নিরাপদ নয়। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকত তাহলে অবশ্যই সে তার পিতামাতার প্রতি সহনশীল হতো। এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখত। যে নিজের মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ না, সে কীভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে?

তেরো. দায়িত্বজ্ঞান, মেজায, আখলাক

খারাশাহ ইবনুল হুর সূত্রে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সামনে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। উমর বললেন, 'তুমি তো সাক্ষ্য দিলে ঠিক, কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি না। কাউকে নিয়ে এসো যে তোমাকে চেনে।' উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললেন-

- আমি তাকে চিনি।

- কী জানো তুমি তার সম্পর্কে?

- আমি তাকে নির্ভরযোগ্য ও সদাচারী হিসেবে জানি।

- তুমি কি তার প্রতিবেশী? দিনে-রাতে সে কী কী করে, সব জানো? -

- জি না।

- তুমি কি তার সাথে কখনো আর্থিক লেনদেন করেছ?

- জি না।

- কখনও তার সাথে সফর করেছ?

- জি না।

- তাহলে তুমি তাকে চেনোই না।

(ইমাম বাইহাকী-আস-সুনানুল কুবরা-১০/১২৫)

তিনভাবে মানুষকে চেনা যায়। প্রতিবেশী হলে, আর্থিক লেনদেনে গেলে আর একসাথে সফর করলে। পাত্র সম্পর্কে আপনাকে সবচেয়ে ভালো তথ্য দিতে পারবে তার প্রতিবেশী, অফিসের সহকর্মী এবং ক্রেতা-অংশীদারগণ (ব্যবসায়ী হলে)। আর তার সফরের সঙ্গীরা। পাত্র যদি তাবলীগী হন, তাহলে তার মহল্লার তাবলীগী সাথীদের থেকে ভালো তথ্য মিলবে, যারা তার সাথে সফর করে। বা পাত্রীর বাবা/ভাই ঐ মহল্লার সাথে তিনদিনের জামাতে সময় দিতে পারেন,যেখানে পাত্র জানবে না যে, এঁরা পাত্রীপক্ষ। দায়িত্বজ্ঞান কেমন, মেজায কেমন, ব্যবহার কেমন, সিফাত কেমন-এগুলো সরেজমিনে জানা যাবে।

পরিশিষ্ট

আমরা যুবকের ক্ষেত্রে যেমন বলেছি, 'হে যুবক, যদি তুমি ফাতিমা -এর মতো কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাও তাহলে তোমাকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো হতে হবে।' অনুরূপ আমরা আমাদের সম্মানিত বোনকেও বলব, 'হে বোন, যদি তুমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র মতো জীবনসঙ্গী চাও তাহলে তোমাকে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র মতো হয়ে যেতে হবে।'

বোন আমার, এগুলো হাতেগোনা কয়েকটি গুণাবলি; একজন পুণ্যবান স্বামীর মধ্যে এ গুণগুলো অবশ্যই থাকতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চাও, তাঁর কাছে দুআ করো-যেন তিনি তোমাকে একজন নেককার স্বামীর ব্যবস্থা করে দেন। যে স্বামী তোমাকে হাত ধরে আল্লাহ পাকের জান্নাত অবধি নিয়ে যাবে। আর জেনে রাখো, বৈবাহিক সম্পর্ক একটি নিয়ামত। এই নিয়ামত আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ছাড়া আসে না।

নবী কারীম বলেন, 'রুহুল কুদুস (জিবরাঈল আলাইহি সালাম) আমার অন্তরে (এ কথা) ঢেলে দিয়েছেন, যে, কোনো ব্যক্তি তার নির্ধারিত সময় পরিপূর্ণ করার আগে এবং নির্ধারিত রিযিক শেষ করার আগে মৃত্যুবরণ করবে না। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এবং যথাযথভাবে চাও। রিযিক আসতে বিলম্বিত হওয়া যেন তোমাদের কাউকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করে রিযিক অন্বেষণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে। কারণ আল্লাহ তাআলার কাছে যা আছে তা তার আনুগত্য ছাড়া অর্জিত হবে না।

(মুসান্নাকু আবদির রাযযাক-১১/১২৫; মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ-৭/৭১; শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকী-৭/২৯৯: হিলয়াতুল আওলিয়া-১০/২৭)

বিয়ের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলি

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখা

পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখার আগেই ইস্তিখারা করা উচিত। পরে করলে একটা বায়াসডনেস কাজ করে, যদি মনে ধরে যায়। জীবনের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আগে ইস্তিখারা করা চাই। চাকরি/ব্যবসা/সাবজেক্ট চয়েস/বিয়ে/সন্তানের বিয়ে। নবীজি যেমন গুরুত্ব সহকারে সূরা শেখাতেন, তেমনই গুরুত্ব দিয়ে ইস্তিখারার দুআ শেখাতেন।' (বুখারী, হাদীস-ক্রম: ১১৬২, অধ্যায়: তাহাজ্জুদ)

আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের ফয়সালা আসার রাস্তা-ওহী তো বন্ধ, কিন্তু ইস্তিখারা বন্ধ হয় নাই।

ইস্তিখারা

সামনে কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে কিংবা কোনো বিষয়ে আল্লাহর দিকনির্দেশনামূলক সাহায্য চেয়ে কায়মনোবাক্যে বিশেষ পদ্ধতিতে দুআ করার নাম ইস্তিখারা। অর্থাৎ ইস্তিখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করে যে, আমি যা করতে চাই তাতে যদি আমার কল্যাণ থাকে তাহলে তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং বরকত দান করুন। আর যদি তাতে কল্যাণ না থাকে তাহলে তা থেকে আমাকে বিরত রাখুন এবং যাতে আমার কল্যাণ তা-ই দান করুন। এটিই হলো ইস্তিখারার সারকথা। ইস্তিখারার জন্য দুটি কাজ করণীয় বলে সহীহ হাদীসে এসেছে। দুরাকাত নামায আদায় করা এবং ইস্তিখারার প্রসিদ্ধ মাসনূন দুআটি মনোযোগের সাথে পড়া। দুআসহ হাদীসটি হলো-জাবির এই সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসূল প্রত্যেক কাজে ইস্তিখারা করা বিষয়ে আমাদের এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেভাবে কুরআনের সূরা শেখাতেন। তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন সে দুরাকাত নফল নামায আদায় করবে, এরপর পাঠ করবে-

اللَّهُمَّ إِنَّ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِيْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ

أَرْضِنِي بِهِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহের কিছু চাই। কেননা আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি অদৃশ্য বিষয়াদির সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করবে) আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর এই কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

(বুখারী, হাদীস-ক্রম: ১১৬২; তিরমিযি, হাদীস-ক্রম: ৪৮০)

সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে এই দুটি কাজ সম্ভব না হলে তিনবার বা সাতবার এই দুআ পড়েও ইস্তিখারা করা যায়-

اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْلِي

'আল্লাহ! আমার জন্য (যা) কল্যাণকর, (সেটাই) নির্ধারিত ও নির্বাচিত করে দিন।'
(ইবনুস সুন্নী, হাদীস-ক্রম: ৫৯৭, ৫৯৮; ইমাম মারূযী-মুসনাদু আবি বকর-৪৪)

অতঃপর যে বিষয়ে অন্তর পরিতৃপ্তি লাভ করবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে সেই কাজ শুরু করুন।

কিন্তু অনেকে মনে করেন, ইস্তিখারার জন্য ঘুমাতে হয় কিংবা রাত্রি বেলায় ঘুমানোর আগেই শুধু ইস্তিখারা করা যায়। এটা ঠিক না, রাত বা দিনের যেকোনো সময়েই করা যায়। এই আমল করার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোনো সময় নির্ধারিত নেই।

আবার অনেকে মনে করেন, স্বপ্ন দেখলেই ইস্তিখারা পূর্ণ হবে। স্বপ্ন দেখবেন এটা জরুরি না, তবে কোনো একদিকে মন আল্লাহর পক্ষ থেকে ঝুঁকে পড়বে, পজিটিভ বা নেগেটিভ।
(মাসিক আল-কাউসার থেকে সংগৃহীত)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, 'সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে না, যে স্রষ্টার নিকট ইস্তিখারা করে এবং মানুষের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় ও এর উপর অটল থাকে।'

[৩]

মেয়ের সকল তথ্যাদি, মা-বোনের রিপোর্ট, ইস্তিখারার রেজাল্ট, মেয়ের পরিবার-আত্মীয় সম্পর্কিত ডেটা নিয়ে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ কোনো আলিমের সাথে পরামর্শ করুন। ওহীর অবর্তমানে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণের ফায়সালার জন্য নবীজি আমাদের দুটি জিনিস শিখিয়েছেন-ইস্তিখারা ও পরামর্শ। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ আলিমের ইশারায় কাজে কনফিডেন্স

পাবেন। আলিম না পেলে অভিজ্ঞ কোনো নেককার বয়স্ক মুরব্বীর সাথেও পরামর্শ করতে পারেন, যিনি আলিমদের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর সূত্রে বর্ণিত হাদীস-

'যে লোক কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে এবং পারস্পরিক পরামর্শ করার পর তা বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়, সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সঠিক ও লাভজনক দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। **১৯**

রাসূল বলেন-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য তো পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহ একে আমার উম্মতের জন্য রহমতের বস্তু বানিয়েছেন। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে, সে সোজা পথের উপর থাকে। আর যে পরামর্শ করে না, সে চিন্তাযুক্ত থাকে।খ

[৪]

পাত্রের বাবা-চাচা-মামারা পাত্রী দেখতে যাবার একটা বাজে কালচার আছে আমাদের সমাজে। বিয়ের পর পাত্রের বাবা মেয়ের মাহরাম হবেন, এর আগে না। সুতরাং এভাবে পাত্রপক্ষের পুরুষ লোকেরা পাত্রীকে দেখা নাজায়েয ও পর্দার খেলাফ। একজন দ্বীনী বোনের পর্দা যেন নষ্ট না হয়, সে ব্যাপারটাও পাত্র খেয়াল রাখবেন।

নিকাহ

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে যাবার পর আপনাকে কঠোর কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা সম্পর্কের শুরুটা আল্লাহর নারাজি দিয়ে শুরু করা মোটেও সমীচীন হবে না। সুন্নাতের খেলাফ কাজ করে, আল্লাহর হুকুম নষ্ট করে যে সম্পর্কের শুরু, তা বারাকাহ-সমৃদ্ধ হবে কীভাবে। মন-খুশি বিয়ে যারা করে, তারা মনকেই কেবল খুশি করে-হৈহুল্লোড়, ফটোগ্রাফি, ভিডিও, গায়ে হলুদ, ডিজে-ডান্স, সাউন্ড সিস্টেম, লৌকিকতা ইত্যাদির মাধ্যমে। মনে রাখবেন, আপনি করছেন আমল, আল্লাহর খুশির জন্য। শুরুতেই ছাড় দেবেন না। নিজের পরিবার, হবু স্বামী/স্ত্রীর পরিবারের কাছে স্পষ্ট করে দিন-বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার চাওয়া-পাওয়া। বিশেষ করে পাত্রী দাবি তুললে ছেলেটার দাবিও জোর পাবে-'আমাদের বিয়েতে ওসব হবে না, ব্যস।' আর পাত্রী দাবি না জানালে পাত্র বেচারাকে অনেক লড়তে হবে, হেরেও যেতে পারে।

ক. গায়ে হলুদ:

গায়ে হলুদ এবং বাগদান (এনগেজমেন্ট) যে হিন্দু সংস্কৃতি থেকে প্রবিষ্ট, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে তুলে দিচ্ছি-

গায়ে হলুদ হিন্দু বিয়ের অন্যতম একটি রীতি। মুসলমান বিয়েতেও এর চল আছে। জানেন কি, বিয়ের অনুষ্ঠানে গাত্রহরিদ্রা বা গায়ে হলুদের প্রচলন কেন হলো? হিন্দু বিয়ের রীতি অনুযায়ী, বিয়ের দিন সকালে হলুদ মেখে স্নান করেন বর-কনে। পুরাণেও হিন্দু বিয়ের রীতিতে হলুদের চল ছিল।

বাংলাপিডিয়া জানাচ্ছে, এর সাথে মঙ্গলের কুসংস্কারও জড়িয়ে আছে-বর-কনের দাম্পত্য জীবনকে যেকোনো ধরনের অকল্যাণ বা অপশক্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখার কামনা থেকেই এসব লোকাচার পালন করা হয়। গায়ে হলুদ এ সবেরই একটি এবং এটি মূলত একটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। হিন্দুসমাজে এ লোকাচার গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস নামে অভিহিত। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ের তিনদিন, পাঁচদিন অথবা সাতদিন আগে বর ও কনের গায়ে হলুদ এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য মাখানো। হলুদ একদিকে পবিত্রতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রসাধনী হিসেবেও উৎকৃষ্ট। আধিভৌতিক ও

অপশক্তির প্রভাব দূর করতে হলুদ অত্যন্ত কার্যকর বলে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এসব কারণেই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের প্রচলন হয়েছে।

এ ধরনের শিরকী অন্ধবিশ্বাসের প্রতীক একটি লোকাচার দিয়ে আপনি কীভাবে আপনার নতুন জীবন শুরু করতে পারেন? সেই সাথে গাইরে মাহরামের ইনভলভমেন্টে ফরয পর্দা নষ্ট হওয়া থেকে নিয়ে ফটোগ্রাফি, ডান্স, ডিজে, লোকদেখানো অহেতুক খরচ, ফ্রিমিক্সিং- অনেকগুলো হারাম কাজের উপলক্ষ এই গায়ে হলুদ ও বাগদান। তাহলে কীভাবে এই বিয়েতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকাহ, সাহায্য ও সুখশান্তি আশা করা যায়?

অনেকে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু'র বিয়ের ঘটনা থেকে 'গায়ে হলুদ' ইসলামেও রয়েছে প্রমাণ করতে চান। ঘটনাটি হলো-

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবদুর রহমান ইবনু আউফের সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর দেহে হলুদ সুগন্ধির চিহ্ন ছিল। রাসূল বললেন, 'কী ব্যাপার আবদুর রহমান! তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি এক আনসারী নারীকে বিবাহ করেছি।

এটা হলুদ ছিল না, এটা ছিল জাফরান। একই ঘটনা মুসনাদে আহমাদে উল্লেখ আছে', সেখানে 'জাফরান' শব্দটির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর জাফরান রঙ ছেলেদের ব্যবহার নিষেধ ছিল। সুতরাং নববধূর শরীর থেকে সাহাবীর শরীরে তা লেগেছিল। আর হলুদ যেমন অশুভ থেকে মঙ্গলের জন্য ব্যবহার হতো, জাফরানের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, কেবলই সৌন্দর্যের জন্য, যার তুলনা হতে পারে মেহেদী। সুতরাং শিরকের নির্যাস এই 'গায়ে হলুদ'- এর সাথে ইসলামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আলিমগণের বিস্তারিত মতামত জানতে মুফতী হাফিজুর রহমান সাহেবের গায়ে হলুদ বনাম ইসলামী রীতি আর্টিকেলটি দেখতে পারেন।
(মুফতী হাফিজুর রহমান (November ৬, ২০১৮), গায়ে হলুদ বনাম ইসলামী রীতি, মা'হাদুল বুহুসিল ইসলানিয়া)

খ. বিয়ে মসজিদে

মুসলমানের বিয়ে-শাদি, বিচার-সালিশ, শিক্ষাদীক্ষা-সকল সামাজিক কর্মকাণ্ডের মারকায বা কেন্দ্র হবে মসজিদ। আজ আমাদের সাথে মসজিদের কত দূরত্ব। মসজিদের নাম আজ কেবলই 'নামায-ঘর'। এজন্যই আমাদের জীবনে বারাকাহ নেই।

মুসলমানের বিয়ে মসজিদে হওয়া উচিত। সুন্নাহ এটাই।

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা বিয়ের ঘোষণা দেবে, বিয়ের কাজ মসজিদে সম্পন্ন করবে এবং এতে দফ বাজাবে।'
(তিরমিযী, হাদীস-ক্রম: ১০৮৯, অধ্যায়: বিবাহ। সনদ দুর্বল)

কনের বাবা মেয়ের অনুমতি নিয়ে মসজিদে যাবেন। ছেলের কাছে প্রস্তাব পেশ করবেন ইমাম সাহেব। ছেলে জোরে বলবেন, 'আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করলাম।' ব্যস, আল্লাহর খাতায় আপনারা বৈধ স্বামী-স্ত্রী।

খেজুর ছিটানো সুন্নাহ। ফাতিমা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র বিবাহের খুতবার পর একপাত্র খুরমা উপস্থিতদের মাঝে ছিটিয়ে দেয়া হয়। কারো বর্ণনায় উপস্থিতদের মাঝে মধুর শরবত ও খেজুর বণ্টন করা হয়েছিল। আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, নবীজি সেখানে খুরমা বণ্টন করেছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করেই কোনো কোনো ফকীহ বিবাহের সময় খুরমা/বাদাম/চিনি ছিটানোকে মুস্তাহাব বলেছেন। (সীরাতু ফাতিমাতিয যাহরা-৯১-৯৩)
যেহেতু বিয়ে একটা আনন্দের উপলক্ষ, নবীজি ছিটিয়ে দিতে বলেছেন, সবাই লাফিয়ে ধরবে। এটা মসজিদের আদবের খেলাফ না। নবীজি যা বলেছেন ওটাই আদব। ভেজা ভেজা আঠালো খেজুর নেবেন না, খোরমা নেবেন, তাহলে ছিটালে মসজিদ ময়লা হবে না। ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়ে রাখবেন, অনুমতি না দিলে দরকার নাই।

গ. কাবিন ও তালাকের অধিকার

কাবিননামা দ্রুত করে ফেলবেন। এখন আমাদের ঈমান দুর্বল, তাকওয়ার অভাব। কাবিন, রেজিস্ট্রি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য। ছেলে কিছুদিন সংসার করে পালিয়ে গেল। বা লজ্জা ভুলে বেহায়ার মতো অস্বীকার করল। তখন? আপনি যেন আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন, বিচার

পান। এজন্য বিয়ের মজলিসেই, না হয় পরে যত দ্রুত সম্ভব কাবিন-রেজিস্ট্রি করে নেয়া উচিত। কাবিননামার ১৮ নম্বর ঘরে 'স্ত্রীকে তালাকের অধিকার দিচ্ছেন কি না'- এখানে 'না' লিখুন। বিয়ের আগেই তালাকের অধিকার দিলে তা 'দেওয়া' হয় না। আলিমগণ এটা নিষেধ করেন। আবার কিছু মূর্খ কাযী লিখে দেয় 'বনিবনা না হলে'। বনিবনা না হলেই স্ত্রীর আমাকে তালাক দেবার অধিকার থাকবে? মাঝে আর কোনো ধাপ নেই? যত্তসব! একটা জীবনের শুরুতেই নিয়ত যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে ফলাফলও তেমনই হবে। নিয়ত করুন-জান্নাতেও দুজনে একসাথে থাকবেন। তালাকের কথা মাথায়ই আনবেন না।

ঘ. বরযাত্রী

কনেপক্ষের উপর আয়োজনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। '৫০০ বরযাত্রী আসছি' আগাম জানিয়ে ব্যবস্থা করতে বলা নিকৃষ্ট ছোটলোকি। আপনার আত্মীয়-স্বজনকে আপনি খাওয়াবেন, আপনার পয়সা নেই? তারপর এসে খাবার নিয়ে সমালোচনা, গেট ধরা, শ্যালিকা হাত ধুয়ে দেয়া-এসব কু-প্রথার অনুমোদন ইসলামে নেই। যদি নতুন জীবনে বারাকাহ চান, আল্লাহর সাহায্য চান-এসব লোকদেখানো, লোকের মন জয় করার নামে জুলুম বাদ দিতে হবে। আপনার স্ত্রীকে আপনার দোযখ বানিয়ে দিতে আল্লাহর এক মিনিটও লাগবে না। নবীজি এই নিজের মেয়েকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র ঘরে দিয়ে আসেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গিয়ে দিয়ে আসেন আম্মাজান আয়েশাকে।উত্তম তো মেয়ের বাড়িতে খানাপিনা হবে না, কনের বাবা গিয়ে কনেকে দিয়ে আসবে। একান্তই মেয়ের বাবা লৌকিকতার তাগিদে খানাপিনার চাপাচাপি করলে সর্বোচ্চ ১০ জন গিয়ে খেয়ে মেয়ে নিয়ে আসবেন। বিয়েতে বরযাত্রী যাওয়া এবং কনেপক্ষের বাড়িতে আপ্যায়ন যদি তাদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও সন্তুষ্টিতে হয় তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিষয়টি খুব বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। কনেপক্ষের উপর জোর করে বিষয়টি চাপিয়ে দেয়া হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমাজ রক্ষার্থে বাধ্য হয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হয়। আবার বরপক্ষের কিছু মূর্খ, নাদান, খাদক ও ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি সেই খাবারে নানা খুঁত ধরে অপমানের চেষ্টা করে থাকে। এধরনের পরিস্থিতিতে বরযাত্রী হিসেবে খাবার খাওয়া জায়েয নয়।
(ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ-৭/৫২২)

রাসূল বলেছেন-

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

'কোনো মুসলমানের আন্তরিক সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ (ভক্ষণ) হালাল নয়।'
(২] বাইহাকী-আস-সুনানুল কুবরা-৬/১৬৬ [১১৫৪৫]। সনদ হাসান লিগাইরিহি)

মোটকথা, আমাদের শরীয়তে মেয়ে বিয়ে দিতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ নেই। মোহর, ওয়ালীমা-সব ছেলেপক্ষের খরচ। ইসলামে মেয়ে পিতার জন্য বারাকাহ। আর আমরা হিন্দুয়ানি প্রথা ঢুকিয়ে মেয়েকে পিতার জন্য বোঝা বানিয়ে দিয়েছি। এজন্য লোকে দারিদ্র্যের ভয়ে জাহিলিয়াতের যুগের মতো এখনও কন্যা-ভ্রূণ হত্যা করে। ইসলাম সহজ করেছিল, আমাদের মন-চাহিদাই তা কঠিন করে ফেলেছে।

ঙ. ওয়ালীমা ও পর্দা

বিয়ের পর ছেলে কর্তৃক আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও গরীব-মিসকীনদের তৌফিক অনুযায়ী আপ্যায়ন করাকে 'ওয়ালীমা' বলে। বাংলায় ওয়ালীমাকে 'বৌভাত' বলা হয়, যদিও বৌভাত মানে 'বৌ কর্তৃক রান্না'। হিন্দু সমাজে ওইদিন নববধূকে প্রথম রান্নাঘরে নেওয়া হয় এবং তার হাতের স্পর্শযুক্ত রান্না খাইয়ে তাকে বরের সমাজভুক্ত করা হয়, এজন্য বলে 'বৌভাত'। হিন্দুয়ানি পরিভাষার পেছনে বিশেষ সংস্কার-অন্ধবিশ্বাস জড়িত। তাই আমাদের উচিত মুসলিম সংস্কৃতির পরিভাষাগুলোকে সংরক্ষণ করা। ওয়ালীমা আমাদের সুন্নাহ ইবাদাত।

বিয়ের পরদিন বা পরবর্তী সময়ে সুবিধামতো নিকটতম সময়ের মধ্যে করা চাই। তবে তিন দিনের মধ্যে করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ এষ্ট্র নিজে করেছেন এবং সাহাবীদেরকে ওয়ালীমা করতে উৎসাহিত করেছেন। নবীজি যাইনাব বিনতু জাহাশ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরদিন ওয়ালীমা করেছেন। (বুখারী, হাদীস-ক্রম: ৫১৭০)
ছাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পরও তিন দিন যাবত ওয়ালীমা খাইয়েছেন।
(মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাদীস-ক্রম: ৩৮৩৪)

আমাদের কমিউনিটি সেন্টার কালচারে শুধু ধনী ও দুনিয়াদার আত্মীয়স্বজন দাওয়াত পায়। এই ওয়ালীমাকে হাদীসে নিকৃষ্টতম ওয়ালীমা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নবীজি বলেছেন, 'ঐ ওয়ালীমার খাবার নিকৃষ্ট, যার মধ্যে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, আর গরীব লোকেদের বাদ দেয়া হয়। (বুখারী, হাদীস-ক্রম: ৫১৭৭)

ওয়ালীমাতে নারীপুরুষের আলাদা ব্যবস্থা হবে। কনে পর্দার সাথে থাকবেন।

নন-মাহরাম কেউ কনে দেখবেন না। কনের ছবি কেউ তুলবেন না, ভেতরের মহিলারাও না। বদদ্বীন মহিলারাও ছবি তুলে স্বামীকে গিয়ে দেখায়। নতুন জীবনের শুরুতেই ফরযের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না। কমপক্ষে নিজের ও নিজের স্ত্রীর পর্দা রক্ষায় কঠোর থাকুন। মানুষকে নয়, আল্লাহকে খুশি করুন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করবেন।

ওয়ালীমাতে উপহার সামগ্রী গ্রহণ

বরযাত্রীর আলোচনায় উল্লিখিত হাদীসে রয়েছে যে, অসন্তুষ্টির সাথে মুসলমানের সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। একই হাদীসের আলোকে ওয়ালীমা-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার-সামগ্রী গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন, চেয়ার-টেবিল বসিয়ে আলাদা লোক নিযুক্ত করে আগত মেহমানদেরকে উপহার দিতে বাধ্য করা হয়েছে। নবীজি বলেছেন, 'ঐ ওয়ালীমার খাবার নিকৃষ্ট, যার মধ্যে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয়, আর গরীব লোকেদের বাদ দেয়া হয়। [৩]

ওয়ালীমাতে নারীপুরুষের আলাদা ব্যবস্থা হবে। কনে পর্দার সাথে থাকবেন।

নন-মাহরাম কেউ কনে দেখবেন না। কনের ছবি কেউ তুলবেন না, ভেতরের মহিলারাও না। বদদ্বীন মহিলারাও ছবি তুলে স্বামীকে গিয়ে দেখায়। নতুন জীবনের শুরুতেই ফরযের সাথে কম্প্রোমাইজ করবেন না। কমপক্ষে নিজের ও নিজের স্ত্রীর পর্দা রক্ষায় কঠোর থাকুন। মানুষকে নয়, আল্লাহকে খুশি করুন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করবেন।

ওয়ালীমাতে উপহার সামগ্রী গ্রহণ

বরযাত্রীর আলোচনায় উল্লিখিত হাদীসে রয়েছে যে, অসন্তুষ্টির সাথে মুসলমানের সম্পদ গ্রহণ করা হারাম। একই হাদীসের আলোকে ওয়ালীমা-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার-সামগ্রী গ্রহণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা যেমন, চেয়ার-টেবিল বসিয়ে আলাদা লোক নিযুক্ত করে আগত মেহমানদেরকে উপহার দিতে বাধ্য করা জায়েয নয়। (বাইহাকী-আস-সুনানুল কুবরা-৬/১৬৬ [১১৫৪৫]। সনদ হাসান লিগাইরিহি; ফতোয়ায়ে)

চ. যৌতুক

কনেপক্ষ থেকে অলংকারের শর্ত করা নিষেধ এবং ছেলেপক্ষ থেকে যৌতুক চাওয়া হারাম।(আহসানুল ফাতাওয়া-৫/১৩)

আগেই বলেছি, মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবার কোনো খরচ ইসলাম রাখেনি। খবরদার! শ্বশুর জামাইকে হাদিয়া দিবে ভালো-কথা, এজন্য সারা জীবন পড়ে আছে। বহুত হাদিয়া দেবে। জাস্ট বিয়ের সময় নেবেন না। এমনকি বরের বাসায় কাপড়চোপড় পাঠানো, তা নিয়ে আবার ছেলেপক্ষের নারীদের গীবতের মজমা বসে- 'কী সস্তা জিনিস দিছে!'

আপনি একটু কঠোর হলে কত গুনাহ রোধ করতে পারেন!

অনেকে যৌতুক নেন না ঠিকই, আবার বউকে কথাও শোনান। বরযাত্রী যান না, আবার শাশুড়ি বউকে খোঁটাও দেন- 'তোমার বাপের তো কোনো খরচই হয়নি, খালি মেয়েটা দিয়েই খালাস।' অনেকসময় এই খোঁটার ভয়েই মেয়ের বাপ বড় অনুষ্ঠান করতে কিংবা যৌতুক দিতে চায়। মুসলিমকে এইভাবে খোঁটা দেয়া/উপহাস করা ভয়াবহ রকমের কবীরা গুনাহ। তাওবা ছাড়া মাফ না হবার আশঙ্কা আছে।

কিছু বিষয়ে আল্লাহর জন্য কঠোর হয়ে যেতে হয়। যারা বেজার হবে, তাদের খুশি করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। আপনার কাজ শুধু আল্লাহকে খুশি করা। যত পরিমাণ সুন্নাহর উপর আমল হবে ধরে নেবেন আপনার দাম্পত্য-জীবন তত সুখের হবে, ইনশাআল্লাহ।

ছ. মোহর

আমার আগে ১ জন মাত্র রাবী, সহীহ সনদ। মেয়ের বাবা মোহর চেয়েছেন ৪০ লাখ টাকা। কেন? 'আমার মেয়েকে যদি ছেলে ছেড়ে দেয়!' কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে ৪০ লাখ টাকা পে করে ঠিকই ডিভোর্স হয়েছে।

বেশি মোহর বিয়ে টেকার ইনসিওরেন্স না, বরং যে বিয়েতে মোহর কম, সে বিয়েতে বারাকাহ বেশি। আম্মাজান আয়েশা সূত্রে বর্ণিত হাদীস, নবীজি বলেছেন, 'কনের বরকতের আলামত

হচ্ছে-বিয়ের প্রস্তাবনা সহজ হওয়া, মোহরানা সহজসাধ্য হওয়া এবং গর্ভ ধারণ সহজ হওয়া।''(শুআবুল ঈমান, হাদীস-ক্রম: ৬১৪৬: হাসান সহীহ)

নবীজি বলেছেন, 'সর্বোত্তম বিবাহ হচ্ছে-সহজসাধ্য মোহরানা।'
(আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম: ২১১৭, অধ্যায়: বিবাহ। সনদ সহীহ)

মোহর বিষয়টার সামাজিক অনেক প্রভাব আছে। আলিমগণের অনেক কিতাবও পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, হঠাৎ যদি আপনি মারা যান, আপনার স্ত্রী-সন্তান যেন পথে বসে না যায়, কিছুটা আর্থিক সিকিউরিটি ইস্যু। তাই বরের সামর্থ্যানুযায়ী যথাসম্ভব মোহর নির্ধারণ করুন। সামর্থ্যের মধ্যেই বেশিটা। লোক-দেখানোর জন্য সামর্থ্যের অতিরিক্ত মোহর দাম্পত্য বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

অনেকে মোহরে ফাতিমী নির্ধারণ করেন; আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে মোহরে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছিলেন। মোহরে ফাতিমী রুপার মূল্যের বাজারদর ওঠানামার ভিত্তিতে সময়ে সময়ে কমবেশ হয়ে থাকে। তাই কোনো পরিমাণকে নির্দিষ্ট মনে না করে প্রয়োজনের সময় বিজ্ঞ কোনো আলিমের কাছ থেকে বাজারদর অনুপাতে চলতি পরিমাণ জেনে নেওয়া কর্তব্য। সামর্থ্যের মধ্যে রিজনেবল ও স্মার্ট কিন্তু পরিমাণটা। তবে আলী-ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কেমিস্ট্রির বারাকাহ পাবার জন্য এটা করা হয়, কেননা এতে স্বয়ং নবীজির অনুমোদন ছিল, সেই হিসেবে। তবে এটাও জরুরি না। জরুরি হলো সামর্থ্যের ভেতরে লৌকিকতা-বিবর্জিত হওয়া। আলিমগণের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না এ বিষয়ে।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। সাবধান অন্য কোনো অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে; বরং এমন অবস্থায় যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।
(আলে ইমরান-১০২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে লোকসকল! নিজ প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে। এবং তারই থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার উসিলা দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের অধিকার খর্ব করাকে ভয় করো। নিশ্চিয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ রাখছেন। (সূরা নিসা- ১)

ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظِيمًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলি শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসরণ করে সে মহাসাফল্য অর্জন করল।
(আহযাব-৭০-৭১)

আমরা আজ পরিবারকেন্দ্রিক একটি মহান বিষয়কে সামনে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। পরিবার হলো সমাজের ক্ষেত্রে দেহের জন্য প্রাণের মতো। অন্তর সুস্থ থাকলে যেমন শরীর

সুস্থ থাকে, অন্তর রুগ্ন হলে যেমন শরীর রুগ্ন হয়, তেমনি পরিবার ঠিক থাকলে সমাজ ঠিক থাকে। পরিবারে অস্থিরতা বিরাজ করলে সমাজ অস্থির হয়ে যায়।

সুতরাং, নিঃসন্দেহে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বের দাবী রাখে। এটাতো মানুষের শান্তির, সাথে সম্পর্কিত। মানুষের হৃদয়ে যখন শান্তি আসে, তখন তার যাপিত জীবনে স্থিরতা বিরাজ করে। তার ইবাদত হয় সঠিক, সে নামাজে হয় বিনয়ী, সিয়ামে হয় উদ্যোমী-ইবাদতের পথ হয় উদ্ভাসিত।

জ্ঞান-সন্ধানী একজন মানুষের জন্য এটাতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ, এই বিষয়টি স্বামী-স্ত্রী, যুবক-যুবতী বা বিবাহ করতে ইচ্ছুক অভিভাবকদের জন্য রীতিমতো চিন্তা ও পেরেশানির কারণ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এটা এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে গোটা সমাজ আজ চিন্তিত। অথচ এর সমাধানে আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের সুন্নাতে পর্যাপ্ত বিবরণ এসেছে।

নিশ্চয় ইসলাম জগতবাসীর জন্য রহমত, কল্যাণ, সুখ, সৌভাগ্য ও পরিশুদ্ধির ধর্ম। দুনিয়া ও আখেরাতে, সর্বস্থানে, সর্বকালে মানুষের উপকারী যাবতীয় বিষয় নিয়ে এ ধর্মের আগমন ঘটেছে।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত এই ধর্ম ব্যতীত মানুষের সুখ অসম্ভব।

আল্লাহ তাআলা যে বিষয়গুলোর আদেশ করেছেন তাতে রয়েছে মানুষের জন্য অগণিত কল্যাণ। আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তাতে রয়েছে

সীমাহীন ক্ষতি।

ইসলাম মানুষের জীবন যাপনের যাবতীয় দিককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে, এমন কোনো দিক নেই যে ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। এর মধ্যে একটি হলো সামাজিক বন্ধন ও সমাজের পরিশুদ্ধতা।

সমাজের স্থিরতা যেহেতু পরিবারের স্থিরতার ওপর নির্ভর করে আর পারিবারিক সুখ নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সাথে, তাই ইসলাম দাম্পত্য জীবনের খুটিনাটি বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

দায়িত্বের গুরুত্ব

স্বামী হলো নৌকার মাঝির মতো। ঘরের প্রধান সে। তার যেমন অধিকার রয়েছে, পাশাপাশি তার ওপর রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। একজন মুসলিম স্বামী তার স্ত্রীর অধিকারগুলো আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে। তাকে এগুলো আদায় করতেই হবে। কেননা সে স্ত্রীর ওপর দায়িত্বশীল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالَا مَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। একজন নেতা তার প্রজাদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষ তার গোটা পরিবারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। (বুখারি-৮৯৩; মুসলিম-১৮২৯)

সুতরাং, সৎ স্বামী জানে তাকে তার স্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। এর ফলে সে তা পূর্ণভাবে আদায় করতে সচেষ্ট হবে।

পুরুষের জানা উচিত যে, এটা তাকওয়ারই অংশ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ

মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।(১০২ মুসলিম-১২১৮)

পুরুষকে তার ওপর অর্পিত স্ত্রীর দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। কারণ এটা তার রাসুল, তার বন্ধু এবং তার মহান নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত। তা লঙ্ঘনের ব্যাপারে ভয় পাওয়া উচিত; অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠা উচিত।

আমাদের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

(মুসলিম-১২১৮)

পুরুষকে তার ওপর অর্পিত স্ত্রীর দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। কারণ এটা তার রাসুল, তার বন্ধু এবং তার মহান নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়ত। তা লঙ্ঘনের ব্যাপারে ভয় পাওয়া উচিত; অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠা উচিত।

আমাদের হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

তোমরা নারীদের ব্যাপারে সদ্ব্যবহারের ওসিয়ত গ্রহণ করো। (বুখারি-৫১৮৬; মুসলিম-১৪৬৮)

একজন সৎ পুরুষের জানা উচিত যে, তার স্ত্রী তার নিকট বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত, তাই অবশ্যই তার আমানতের হেফাজত করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ

নিশ্চয় তোমরা তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ। (আবু দাউদ-১৯০৫; ইবনে মাযাহ-৩১৭৪)

পূণ্যময় একজন স্বামী তার স্ত্রীর হক আদায় করবে বিনিময়হীনভাবে। কেননা সে তার রবের পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সুতরাং, হে পুরুষ সমাজ, আমাদের উচিৎ, আমাদের ওপর অর্পিত আমাদের স্ত্রীদের অধিকারগুলোকে জানা এবং আমাদের সন্তানদেরকে তা শিক্ষা দেওয়া। যাতে আমরা আমাদের ওপর অর্পিত যিম্মাদারি পূরণ করতে পারি।

ভারসাম্য রক্ষা করে স্ত্রীর জন্য খরচ করা

স্বামীর জন্য কর্তব্য হলো, স্বাভাবিক ও ন্যায়ভাবে স্ত্রীর জন্য খরচ করা। সে যখন খাবে তখন স্ত্রীকেও খাওয়াবে। যখন পড়বে স্ত্রীকেও পড়াবে।

মোটকথা, স্বাভাবিক চাহিদা এবং অভ্যাসের ভেতরে থেকে স্ত্রীর জন্য খরচ করবে। এক্ষেত্রে অপচয় কিংবা কৃপণতা কোনটাই কাম্য নয়।

কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তোমাদের ওপর সৎভাবে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করা

স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, শরিয়তবিরোধী না হলে স্ত্রীর চাহিদাগুলোর ক্ষেত্রে তার সাথে উত্তম আচরণ করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ

জেনে রাখো, তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, এটা তাদের অধিকার। (তিরমিযি-১১৬৩; নাসাঈ-৯১২৪;)

স্ত্রীকে প্রহার না করা

স্ত্রীকে অযথা মারধর করবে না। তাকে প্রহার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

হ্যাঁ, যদি স্ত্রী তার স্বামীকে অমান্য করে, বা বেশি অবাধ্য হয়ে যায়, তাহলে এক্ষেত্রে শরিয়ত নির্দেশিত পথে তাকে শাসন করতে হবে। প্রথমে তাকে বোঝাবে, তাতে কাজ না হলে পরবর্তী ধাপে তার সাথে কথা বলবে না। শয্যা ত্যাগ করবে। তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে তাকে প্রহার করবে।(সহিহাহ-৫/৪৬৭।)

তবে এই প্রহারও হতে হবে শরিয়তের গণ্ডীর ভেতরে থেকেই। প্রতিশোধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র তাকে ঠিক করাই হবে এই প্রহারের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। কখনোই তার চেহারায় মারা যাবে না।

সুতরাং শরিয়ত যে ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ অনুমতি দিয়েছে, এই অনুমোদিত পদ্ধতির বাইরে গেলে অবশ্যই তা জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে।

তবে এই প্রহারও হতে হবে শরিয়তের গণ্ডীর ভেতরে থেকেই। প্রতিশোধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, একমাত্র তাকে ঠিক করাই হবে এই প্রহারের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য। কখনোই তার চেহারায় মারা যাবে না।

সুতরাং শরিয়ত যে ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ অনুমতি দিয়েছে, এই অনুমোদিত পদ্ধতির বাইরে গেলে অবশ্যই তা জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ضَرَبَ ضَرْبًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ

যে অন্যায়ভাবে চুল পরিমাণ প্রহার করবে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই তার বদলা নেওয়া হবে। (আদাবুল মুফরাদ-১৮৬; বাযযার-১৭/৯৫৩৫: আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন:

ولا يضرب الوجه

কেউ যাতে গালে থাপ্পর না দেয়।
(আহমাদ-৪/৪৪৬,৪৪৭; আবু দাউদ-২১৪২; ইবনে মাজাহ-১৮৫০;)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيًّا كَبِيرًا

আর যে সকল স্ত্রীর ব্যাপারে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা করো, (প্রথমে) তাদেরকে বোঝাও এবং (তাতে কাজ না হলে) তাদেরকে শয়ন শয্যায় একা ছেড়ে দাও। (তাতেও সংশোধন না হলে) তাদেরকে প্রহার করতে পারো। তারপর তারা যদি তোমাদের আনুগত্য করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজবে না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে বড়।(নিসা-৩৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত হলে কোনোভাবেই তাকে প্রহার করা বা তার সাথে বসবাস ত্যাগ করা যাবে না।
আর আল্লাহর বাণী,

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে বড়।

এটা হলো স্বামীদের ক্ষেত্রে সতর্কবাণী। কেননা সর্বমহান সত্তা আল্লাহ হলেন স্ত্রীদের অভিভাবক। অবশ্যই তিনি তাদের প্রতি কৃত জুলুমের বদলা নেবেন।

সুতরাং, আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করে অপরাধ ছাড়াই কিংবা শরিয়তের অনুমোদন ব্যতীতই স্ত্রীকে মারতে চান, তাহলে মনে রাখবেন, তার অভিভাবক হলো সেই মহান সত্তা, যিনি সর্ববিষয়ে কর্মশীল। তার দায়িত্ব নিয়েছেন সেই প্রভু, যিনি মহা ক্ষমতাধর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ وهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُن

তাদের ওপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে, তারা তোমাদের গৃহে এমন লোককে প্রবেশ করতে দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ কর। কিন্তু তারা যদি নির্দেশ লঙ্ঘন করে এরূপ করে ফেলে, তাদেরকে প্রহার করো। তবে হ্যাঁ, প্রহার যাতে কঠিন ও কষ্টদায়ক না হয়।(প্রাগুক্ত)

নবীজি একবার সাহাবিদের বললেন:

لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ

আল্লাহর বান্দীদেরকে তোমরা প্রহার করো না।
উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন :

ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ

যদি সে স্বামীর ওপর উদ্ধত হয়?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন :

لا بأس في ضربهن

তাহলে তাদের প্রহারে সমস্যা নেই।
(আবু দাউদ-২১৪৬; নাসাই-৫/৯১৬৭; ইবনে মাযাহ-১৯৮৫; তবরানি-১/২৭০; ইবনে হিব্বান-৯/৪১৮৯; হাকেম-২/২৭৬৫; হাকেম হাদিসের সনদকে সহিহ সাব্যস্ত করেছেন)

এরপরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন; কিন্তু কেন?

কারণ প্রথমে যখন তিনি তাকে মারতে নিষেধ করেছিলেন, তখন সে তো হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু মহিলার ক্রোধ থামেনি। তাই শেষমেশ তাকে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন।

অনেক নারীই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের নিকট এসে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে এটা সেটা অভিযোগ করত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের উদ্দেশে বলেন:

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে এসে নারীরা তাদের যেসব স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করে, সেসব স্বামী তোমাদের মাঝে উত্তম নয়।
(বুখারী:৫৩৬৩)

সুতরাং হে স্বামীরা, আল্লাহ যে ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন, তা ব্যাতিরেকে স্ত্রীকে প্রহার করা ভালো কাজ নয়।

স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করা

স্বামীর কর্তব্য হলো, কথায়-কাজে স্ত্রীর প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে যদি একটু বাড়িয়ে বলতে হয়, কিংবা ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কিছু বানিয়ে বলতে হয়, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভালোবাসা প্রকাশের জন্য কথাবার্তায় মিথ্যা বলার অবকাশ দিয়েছেন।

সুতরাং, ঘরে শান্তি আনার জন্য স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলা, তার সৌন্দর্য নেই তবুও তাকে সুন্দর বলা, অন্তরে তার প্রতি অনুরাগ নেই তবুও ভালোবাসা প্রকাশ করা এবং মুহাব্বতের কথা বলাতে অসুবিধা নেই।

ধরুন, স্ত্রী তার স্বামীর নিকট কিছু চাইল, কিন্তু স্বামী তা যোগাড় করতে পারছে না। কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে যে, অপারগতার কথা বললে তার জীবনটা জাহান্নামের ন্যায় অতীষ্ঠ হয়ে যাবে; তাহলে তার জন্য এ কথা বলার অনুমতি আছে যে, 'ইনশাআল্লাহ নিয়ে আসব।' আবার চাইলে বলবে, 'বাজারে পাইনি' বা বলবে 'দাম অনেক বেশি'। মূলত, এ ধরনের মিথ্যা কল্যাণের জন্যই, কেননা তা দাম্পত্যজীবনে সুখ আনে।

স্ত্রীর জন্য পরিপাটি থাকা

একজন পুরুষ তার বিবির জন্য যতটুকু সম্ভব সুন্দরভাবে পুরুষালি সাজ গ্রহণ করবে। প্রসাধনী ও বিভিন্ন অঙ্গরাগ ব্যবহার করবে।

কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর স্ত্রীদেরও ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে। (বাকারা:২২৮)

রঈসুল মুফাসসিরিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন:

اني أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي

আমার স্ত্রী আমার জন্য সাজুক, আমি যেমন তা পছন্দ করি। তেমনি আমিও তার জন্য সাজতে পছন্দ করি।

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করা

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি মাধ্যম হলো, ঘরের কাজে তাকে সহযোগিতা করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও ঘরে থাকা অবস্থায় ঘরের কাজ করতেন, নামাজের সময় হলে বেরিয়ে যেতেন।

বর্ণিত আছে,

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى

ঘরে থাকা অবস্থায় তিনি তার ঘরের কাজ করতেন। নামাযের সময় হলে নামাযে চলে যেতেন।
(ইবনে আবি শাইবা-৫/২৭২; আত তাফসির লি-ইবনে আবি হাতেম- ২/২১৯৬: তবারি-৪/৪৭৬৮; বায়হাকি-৭/২৯৫)

উত্তম সহাবস্থান নিশ্চিত করা

আমাদের নবি ছিলেন উত্তম সহাবস্থানকারী। সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল। তিনি তার পরিবারের সাথে খেলাধুলো করতেন, রসিকতা করতেন, তাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন। তিপ্পান্ন বছর বয়সেও তিনি আম্মাজান আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি কোনো এক সফরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের এগিয়ে যেতে বললে তারা এগিয়ে গেলেন। তারপর তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন,

'আয়েশা এসো। দৌড় প্রতিযোগিতা দেই।'

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন
আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। এবং আমিই এগিয়ে গেলাম।'

বড়ই অবাক করার বিষয়! তিনি একজন আল্লাহর রাসুল! বয়স ৫০ ছাড়িয়ে গেছে। এই বয়সেও তিনি এসব করেছেন। দেখুন, কেমন ছিল তার পারিবারিক সহবস্থান।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'তারপর অনেকদিন অতিবাহিত হলো, আমিও মোটা হয়ে গেলাম। আগের সবকিছুই ভুলে গেলাম। একদিন সফরে বের হলে তিনি তার সাথীদের এগিয়ে যেতে বলে আমাকে আবার প্রতিযোগিতার আহ্বান জানালেন।

আমি বললাম,

'এই অবস্থায় আমি কিভাবে দৌড় দেব!'

রাসুল বললেন,

'তোমাকে দৌড় দিতেই হবে।']

'আমরা দৌড় দিলাম। কিন্তু এবার তিনি জিতে গেলেন। জেতার পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন,

"আয়েশা, এটা আগেরটার বদলা!!"
(ইবনে হিব্বান-১০/৪৬৯১; নাসাই-৫/৮৯৪২; আহমাদ-৬/৩৯; হুমাইদি-১/১২৮/২৬০)

লক্ষ্য করেছেন কি?

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা এ ঘটনা ভুলেই গিয়েছিলেন, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভোলেননি; বরং তার স্ত্রীর সাথে খেলা করেছেন। তার মনজয় করেছেন। তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা খেলেছেন।

আর এটা তো হয়েছিল তার জীবনের শেষ সময়ে! আমাদের নবির উত্তম সাংসারিকতার আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা একবার বলে উঠলেন,

'আহ! আমার মাথা ধরেছে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমার মাথা ব্যাথার কারণে আমারও মাথা ব্যাথা করছে।
আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضُ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الموضع الَّذِي فِيهِ وَضَعَهُ
وَالرب الشَّرَاتِ فَأَنَا لَهُ فَيَضَعُفَهُ فِي فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ

আমার মিন্স চলাকালে খাবারের সময় হাড় চুষতাম। তারপর সেটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিলে, তিনি আমার মুখ লাগানো অংশের দিক দিয়েই খেতেন। আমি যেই অংশ দিয়ে পান করতাম তিনিও সেই অংশে মুখ লাগিয়ে পান করতেন।

(মুসলিম-৩০০)

তিনি আরও বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ

আমার মিন্স চলাকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।
(বুখারি-২৯৭; মুসলিম-৩০১; আবু দাউদ-২৬০)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো স্ত্রী ঋতুবর্তী হলেও তিনি তাদের সাথে এক কাঁথায় ঘুমাতেন। এতে করে কোনো জায়গায় রক্ত লাগলে পরে তা ধুয়ে নিতেন।
(আবু দাউদ-২৬৯; নাসাই-২৮৪; আহমাদ-৬/৪৫।)
তিনি তার স্ত্রীদের সাথে এক পাত্র থেকে একসাথে গোসল করতেন।
(বুখারি- ২৭৩; মুসলিম-৩২১)

পরিবারের সাথে এমনই ছিল আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহবস্থান। তিনি তো আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। নিশ্চয় তার মাঝে রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। অনেক স্বামীরা হয়তো বলবেন, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, আমাদের নিকট সময় নেই। জীবনের এতোটা সময় চলে গেছে, এখন আর এগুলোর প্রয়োজন নেই।
লক্ষ করুন, তিনি তো আল্লাহর রাসুল। বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের ঘাড়ে যে দায়িত্ব নেই, তার একার ওপরেই তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব ছিল। গোটা উম্মতের চিন্তা, রিসালাহর দায়িত্ব, আবার জীবনের শেষ সময়। এরপরেও তিনি তার স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। এর জন্য সময় বের করেছেন।

প্রিয়, চিন্তা করুন তো! এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে বের হলো, তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিলো, আনন্দ-উল্লাসে সময় কাটাল-কত সুন্দর দিলকাড়া সে দৃশ্য!

স্ত্রীকে গালিগালাজ না করা

স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, স্ত্রীকে কখনো গালিগালাজ না করা। তার কাজ বা গঠন নিয়ে কটুক্তি না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামী যাতে তার স্ত্রীকে গাল-মন্দ না করে।

(আবু দাউদ-২১৩২)

স্ত্রীকে ছেড়ে যাবে না

স্ত্রীকে কখনো ছেড়ে যাবে না। তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না।

হ্যাঁ! শরিয়ত অনুমোদিত কারণে তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হলে কেবল তার সাথে কথা বা শয্যা পরিত্যাগ করবে; কিন্তু ঘর ছাড়া করা যাবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ولا يهجر الا في البيت

তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না।

স্ত্রীর গোপনীয়তাগুলো রক্ষা করা

স্ত্রীর গোপনীয় কোনো কিছু অন্যের নিকট প্রকাশ করা যাবে না। দরজার ভেতরের কথা কোনোভাবেই যাতে বাইরে বের না হয়। বিশেষ করে একান্তে যাপিত সময়ের বিষয়গুলো। এ ব্যাপারে দলিলগুলো আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

স্ত্রীকে না রাগানো

স্ত্রীকে রাগানো যাবে না। তার দোষগুলো এড়িয়ে গিয়ে গুণগুলো দেখতে হবে। দোষগুলোকে তুচ্ছজ্ঞান করে গুণগুলোকে বড় করে দেখতে হবে। যতটুকু সম্ভব তার মধ্যে কল্যাণ খুঁজতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا ، رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে শত্রুর মতো মনে না করে। কারণ, তার কোনো আচরণ অপছন্দ হলেও অন্য কোনো আচরণ পছন্দ হবেই।(মুসলিম-১৪৬৯।)

তার ওপর কোন কিছু চাপিয়ে না দেওয়া

স্ত্রীর ওপর চাপাচাপি করা যাবে না। সহজে তার অভ্যাস অনুযায়ী যতটুকু আদায় করা সম্ভব হয় তাতেই রাজি থাকতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

তোমরা নারীদের ব্যাপারে উত্তম উপদেশ গ্রহণ করো। কারণ নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা।

সুতরাং তুমি যদি সেটা সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি এমনি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাঁকাই থাকবে। কাজেই নারীদের সাথে কল্যাণমূলক কাজ করার উপদেশ গ্রহণ করো। (বুখারি-৩৩৩১; মুসলিম-১৪৬৮)

তিনি আরও বলেছেন:

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا. كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

মহিলাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে বানানো হয়েছে। সুতরাং কখনোই সে সোজা পথে আসবে না। যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও তো বাঁকা অবস্থাতেই উপকৃত হতে হবে। অন্যথায় যদি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। "(বুখারি-৩৩৩১; মুসলিম-১৪৬৮)

এ হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য হলো, পুরুষ যেন স্ত্রীর স্বভাব বুঝতে পারে। সহজেই তার থেকে যা হাসিল হয়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে। যদি সে তা না বোঝে তাহলে তো স্ত্রীর ওপর সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেবে। যার ফলে সেই কাজে সে ভুল করবে। তারা তো সৃষ্টিই হয়েছে দুর্বলরূপে।

নিজের ভালোগুলো তার নিকট ফুটিয়ে তোলা

স্বামীর জন্য আবশ্যক হলো, স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করা। নিজের মাঝে যতটুকু গুণ আছে, স্ত্রীর সামনে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। কিছু ব্যক্তি এমন রয়েছে যারা বাজারে কিংবা বন্ধুদের আড্ডায় নিজের সেরাটা দেয়। কিন্তু তারাই ঘরে এসে সিংহ বনে যায়। শুধু রাগ আর গালাগালি ছাড়া ভালো কিছুই উদগীরণ করে না। ভালো করে কোনো কথাই বলে না।

অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم

তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুমিন তো সে-ই- যার চরিত্র সর্বাধিক সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে উত্তম, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।(তিরমিযি-**১১৬২**; আহমাদ-২/২৫০,৪৭২; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান, সহিহ বলেছেন)
বাজারের বন্ধু-মহলে কিংবা অন্যান্য সকল মানুষের কাছে আপনি যতই ভালো হোন না কেন, নিজের সহধর্মীনির কাছে ভালো না হলে কখনোই আপনি প্রকৃত ভালো মানুষ বলে বিবেচিত হবেন না। যদি আপনি আপনার পরিবারের জন্য নিজের সেরাটা দিতে পারেন তবেই শ্রেষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

خيرُكُمْ خِيرُكُمْ لاهله وأنا خيرُكُمْ لاهلي

সবচেয়ে উত্তম তো সে-ই, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর জেনে রেখো, আমি আমার পরিবারের নিকট সবচেয়ে উত্তম।
(দারেমি-২/২২৬০; তিরমিযি-৩৮৯৫; ইবনে হিব্বান-৯/৪১৭৭; তিরমিযি রহ. হাদিসটিকে হাসান, গরিব, সহিহ বলেছেন)

তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হবে

স্বামীকে হতে হবে স্ত্রীকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার মাধ্যম। সে তাকে শিক্ষা দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, ভালো কাজের আদেশ দিয়ে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রেখে এ দায়িত্ব পালন করবে এবং এর ওপর অটল থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ

তোমরা নিজেকে ও আপন পরিবারকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। (আত-তাহরিম-৬)

তিনি আরও ইরশাদ করেন:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

এবং নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ করো এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক।
(ত্বহা:১৩২)

নিজেকে হতে হবে আত্মমর্যাদার অধিকারী

স্ত্রীর ওপর আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই তা হতে হবে সঠিক ক্ষেত্রে- যা কল্যাণ আনে, অকল্যাণকে নিবৃত রাখে। স্ত্রীর ওপর এতোটা প্রভাব বিস্তার করতে হবে, যাতে স্ত্রী পরপুরুষের সামনে চেহারা খুলতে, তাদের দিকে তাকাতে, মিশতে এবং প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেও ভয় পায়। এটাকে গায়রাত বলা হয়। তবে এর অর্থ অহেতুক সন্দেহ করা নয়। এমনটা হারাম।

কিছু লোক আছে, নিজেদেরকে আত্মসম্মানের অধিকারী ভাবে। অযথাই স্ত্রীকে সন্দেহ করে তার পেছনে পড়ে। ঘরে ঢুকতেই ফোনের কললিস্ট চেক করে। ফোন বাজলেই দৌড়ে গিয়ে রিসিভ করে শোনে কে কথা বলছে? এসব বিষয়ে তার পেছনে পড়ে যায়, তার ওপর তদন্ত চালায়। এটাকে তারা গাইরাত ভাবে। কিন্তু ভাই, এটা প্রকৃত গায়রাত নয়; বরং এমন সন্দেহমূলক আচরণ হারাম।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ

কিছু আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ পছন্দ করেন। আর কিছু আছে তিনি অপছন্দ করেন। তার পছন্দনীয় গায়রত হলো যা যথাস্থানে হয়। পক্ষান্তরে অমূলক জায়গার গায়রত আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।
(আবু দাউদ-২৬৫৯; নাসাই-২৫৫৮; ইবনে হিব্বান-১১/৪৭৬২; আহমাদ-৫/৪৪৫,৪৪৬)

প্রিয় ভাই,

স্ত্রীর অধিকার ও একটি পরিবার গঠনে এগুলোই হলো শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি। স্বামীরা যদি এগুলো মেনে চলে গোটা পরিবারে অনাবিল আনন্দের জোয়ারে বইতে শুরু করবে ইনশাআল্লাহ!

প্রিয় পাঠক,

এ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলাম। আলোচনায় বর্ণিত প্রতিটি হাদিসই সনদভিত্তিক,
আহলে ইলমের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণসিদ্ধ। প্রতিটি হাদিসই সনদের মানে অন্তত হাসানের পর্যায় উন্নীত।

এগুলো একজন সৎ স্বামীর গুণ। সৎ স্বামীকে এমনই হতে হবে।

কিন্তু যে স্বামী অসৎ সে শুধু নিজের হকগুলোই আদায় করতে চাইবে, স্ত্রীরও যে কিছু অধিকার আছে তার প্রতি গুরুত্বই দেবে না। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে। তাকে অতীষ্ঠ করে তুলবে। স্ত্রী তার কাছে কিছু চাইলে দেবে তো না-ই, উল্টো তাকে আরও ঘৃণা করবে। বারবার চাইলে অসভ্য অঙ্গভঙ্গি করবে, পিড়াপীড়ি করলে মারধর করবে। ঘরে থাকবে অসুন্দর পোষাকে, বাইরে যাবে চুল-দাড়ি চিরুনি করে, সেজেগুঁজে।

নিঃসন্দেহে এসবের কারণেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ হয় এবং তালাকের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

প্রিয় ভাই,

একটি সর্বসিদ্ধ নিয়ম বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো।

তিনি আরও ইরশাদ করেন:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি স্বামীর অধিকার রয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম বলেন, الْمَعْرُوف ِ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো, যা কিছু সাধারণত অভ্যাস সাপোর্ট করে। যে কোনো বিষয়ে দুজনেই পরামর্শ করা। প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। সুখ আনতে একে অন্যের সাহায্য করা। এগুলোই হলো এর অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী তার নিজস্ব বিষয়গুলোতেও স্বামীর সাথে পরামর্শ করবে, তার মতামত গ্রহণ করবে, তাকে ও তার পরিবারকে সম্মান করবে। স্বামীর ঘরে অবস্থান করে, সুখ আসে এমন কাজে তাকে সহায়তা করবে।

দ্রূপ স্বামীও স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করবে। সঠিক হলে তার মতামত গ্রহণ করবে। তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। যতটুকু সম্ভব তার ভালোগুলোকেই দেখবে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য

স্বামীর হক গালনের গুরুত্ব

একজন মুসলিম রমণীর উচিত স্বামীর হক আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও প্রতিদানের আশা করা। বদলা স্বরূপ এমনটা না করা।

যেমন ধরুন, স্বামী তাকে কিছু দিলে সেও দেবে; না দিলে, দেবে না-এমনটি নয়; বরং কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ থেকেই আদান-প্রদান করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فأنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا

তোমাদের দায়িত্বের ভার তোমাদের ওপর আর তাদের দায়িত্বের ভার তাদের ওপর।
(মুসলিম-১৮৪৬)

সে স্বামীর হকগুলো এটা ভেবে আদায় করবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

একজন পূণ্যময়ী মুসলিম রমণীর জানা উচিত, তার ধর্ম স্বামীর অধিকারগুলোকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أمرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْبَرَأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَوْ كُنْتُ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

আমি যদি কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীদের বলতাম তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করতে। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। স্বামীর হক পূর্ণরূপে আদায় করা ব্যতীত কোনো মহিলা আল্লাহর হক যথাযথ আদায় করতে পারবে না। এমনকি স্বামী যদি যাত্রাপথে ঘোরার পৃষ্ঠেও তাকে (মনোবাঞ্ছা পুরণের) আহ্বান করে, তবুও তাকে সাড়া দিতে হবে।
(তাবরানি-৫/৫১১৬,৫১১৭; আলবানি এটিকে সহিহ বলেছেন- প্রাগুক্ত-৩৩৬৬)

রাসুলের কথা অনুযায়ী একজন মুসলিম নারী স্বামীর হক আদায় করার মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ পেতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا تَجِدُ امْرَأَةٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

একজন মহিলা তার স্বামীর হক পরিপূর্ণ আদায় করার আগে ঈমানের স্বাদ পাবে না। (হাকেম-৪/৭৩২৫; তার বর্ণনা মতে এটি শায়খাইনের শর্তে উত্তীর্ণ এবং হাফেয যাহাবি)

একজন নেক স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর হক আদায়ে নিজেকে নিবেদিত করা। স্বামীর হকের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া।

কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলেছেন, যার দ্বারা বোঝা যায়, স্বামীর হক আদায় করা অন্যান্য যাবতীয় বিষয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

الْمَرْأَةُ لَا تُؤَدِّي حَقَّ اللهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا

স্বামীর হক পূর্ণরুপে আদায় করা ব্যতীত কোনো মহিলা আল্লাহর যথাযথ হক আদায় করতে পারবে না। (তাবরানি-৫/৫০৮৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

لَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِهِ عَلَيْهَا

যদি মানুষের জন্য মানুষকে সেজদা করা বৈধ হতো, তাহলে আমি মহিলাদেরকে তাদের স্বামীকে তাদের সম্মানের কারণে সেজদা করার আদেশ দিতাম। (আহমাদ-৩/১৫৮; আলবায্যায়-১৩/৬৪৫২; নাসাঈ কুবরা-৫/৯১৪৭।)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন:

لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ مَا قَعَدَتْ مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

স্ত্রী যদি স্বামীর হক বুঝতে পারত, তাহলে সকাল-সন্ধ্যা যা-ই ব্যবস্থা হতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকত।(তবরানি-২০/৩৩৩; বায্যার-৭/২৬৬৫)

একজন মুসলিম সৎ নারীর উচিত, স্বামীর হক আদায় করার মাধ্যমে কখনো এটা মনে না করা যে, এর মাধ্যমে সে স্বামীর ওপর অনুগ্রহ করছে।

তাকে দ্বীন মোতাবেক চলতে হবে। দ্বীনের ওপর চলার দরুন তার বুঝে আসবে, স্বামীর মর্যাদা কতটুকু। সেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহাবাণীর ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে; যার ব্যাপারে তার রব বলেছেন:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

হে মানুষ, তোমাদের কাছে এমন এক রাসুল এসেছে, যে তোমাদের নিজেদেরই লোক। তোমাদের যে কোনো কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু। (তাওবা-১২৮)

মানুষরূপী ওইসব শয়তানদের কথায় কান দেওয়া যাবে না, যারা ওপরে ওপরে শান্তি ও অধিকারের কথা বললেও ভেতরে পোষণ করে স্পষ্ট কুৎসা আর অসৎ উদ্দেশ্য। নিশ্চয় একজন মহিলাকে ধ্বংস করার জন্য শয়তান তার মানুষরূপী বন্ধুদের সাহায্য কামনা করে।

পূণ্যবতী রমণীর জানা উচিত, তার ঘরে সে সুবিধাবাদী কিংবা কাজের মেয়ে নয়; বরং সে এ ঘরের দায়িত্বশীল, তার একটা নিজস্ব অবস্থান রয়েছে।

স্বামীর হক আদায় করাও তার সে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

একজন মহিলা তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। তাকে অবশ্যই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। "
(বুখারি-৮৯৩; মুসলিম-১৮২৯)

তিনি আরও বলেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

যাকে আল্লাহ তাআলা দায়ীত্বশীল বানান আর সে তার অধীনস্তদের সাথে প্রতারণাকারী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন। "
(মুসলিম-১৪২)

আমাদেরও কর্তব্য আছে। আমাদের উচিত আমাদের মেয়েদেরকে স্বামীর হকগুলো শেখানো- যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। এতে তারা তাদের রবের হুকুমের ওপর সন্তুষ্ট হবে। সৌভাগ্য খেলা করবে তার গোটা ঘরে।

স্বামীর বৈধ আদেশ মান্য করা

স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো, বৈধ কাজে স্বামীর অনুগত হওয়া। কোনো ছুতা দেখিয়ে বিরত না থাকা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'শ্রেষ্ঠ রমণী কে?'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

التي تطيع زوجها اذا أمرها

স্বামী আদেশ করামাত্রই যে তা পালন করে।
(নাসাঈ-৩২৩১; আহমাদ-২/২৫১; হাকেম-২/২৬৮২ তিনি এটিকে শায়খাইনের শর্তে উত্তির্ণ হওয়ার কারণে সহীহ বলেছেন। এবং আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন। সহীহাহ-১৮৩৮;)

সুতরাং, বরকতময়ী রমণী তো সে-ই- যে রাসুলের ঘোষিত সেই সম্মান প্রাপ্তির জন্য আদেশ করামাত্রই স্বামীর আদেশ পালন করে; আল্লাহর অপার সৃষ্টি সেই জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে- যা তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য বানিয়েছেন, যে জান্নাত আজও কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি, কোনো হৃদয়ে তার চিত্রও কল্পিত হয়নি।

একজন রমণীর জানা উচিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করলো, রমজানের রোজা রাখলো, লজ্জাস্থানের হেফাজত করলো এবং স্বামীর আনুগত্য করলো; তাকে বলা হবে, তোমার যে দরোজা দিয়ে মন চায় জান্নাতে প্রবেশ করো।”
(আহমাদ-১৬৬১; তবরানি-৮৮০৫;)

স্বামীর অবাধ্যতায় প্রভুর ক্রোধ ও শাস্তিকে ভয় করতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ : امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُون.َ

দুই শ্রেণীর বান্দা কেয়ামতের দিন কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে; যে মহিলা তার স্বামীর অবাধ্য, আর জাতির এমন নেতা যাকে জাতি অপছন্দ করে। ১০৭

সৎ মহিলা স্বামীর অনুগত হয়। তার অবাধ্যতাকে ভয় করে। কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশা করে। আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। তবে হ্যাঁ, অবৈধ বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ কোনো কাজে স্বামীর অনুগত হওয়া যাবে না।

যেমন ধরুন, স্বামী তার স্ত্রীর কাছে না-জায়েয পদ্ধতিতে সুখ হাসিল করতে চাইল, অথবা তাকে ভ্রুর চুল উপড়ানোর মতো অবৈধ পন্থায় সাজতে বললো-এক্ষেত্রে সে স্বামীর আদেশ মানবে না।

কোনো কোনো মহিলা আমার সাথে যোগাযোগ করে বলে, 'শায়খ, আমার স্বামী আমাকে বলে, তোমার ভ্রুর চুল কেটে ফেলো! আমি কি এমনটা করব?'

কেউ এসে অভিযোগ করে, 'স্বামী বলেছে চুল কাটতে, পরচুল লাগাতে। আমি কি স্বামীর কথা মানবো?'

আমি বলি, 'অবশ্যই স্বামীর হক গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু স্বামীর এসব অন্যায় আদেশ মানা জায়েয নেই।'

একবার এক নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, তার চুল পড়ে যায়। এখন তার স্বামী তাকে পরচুলো লাগাতে বলছে।"

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ُقَدْ لُعِنَ المُوصِلات

যে আলগা চুল লাগায় তার ওপর লানত করা হয়েছে।(বুখারি-৫২০২; মুসলিম-২১২৩)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন: ِلا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِق

আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না।
(আহমাদ-৪/৪২৬; হাকেম-৩/৮৫৭০; তবরানি-১৮/৩৮১; হাকেম এর সনদকে সহিহ বলেছেন আর যাহাবি রহ.-এর সাথে মুআফাকাত করেছেন। সহিহাহ-১৭৯। ভিন্ন শব্দে হাদিসটি বুখারি, মুসলিমেও এসেছে। বুখারি-৭২৫৭; মুসলিম-১৮৪০।)

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

স্ত্রীর জন্য কর্তব্য হলো, স্বামী যা-ই ব্যবস্থা করতে পারে তাতেই কৃতজ্ঞচিত্তে তার সাথে বসবাস করা।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার দিকে (সন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, যে তার স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়।
(নাসাঈ-৫/৯১৩৫; হাকেম-২/২৭৭১; বাযযার-৬/২৩৪৯)

বিবির জন্য আবশ্যক হলো, স্বামীর অকৃতজ্ঞতাকে ভয় করে নিজেকে এই বলে প্রস্তুত করা যে, কখনো সে স্বামীর অকৃতজ্ঞ হবে না।

কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَرَأَيْتُ النَّارَ ، فَلَمِ ارَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا: لَمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوِ احْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَاتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলে সেখানে আমি দেখি, তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক- যারা কুফরি করে। জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করে?

তিনি বললেন, না, বরং তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে। যদি তুমি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করে থাকো, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলবে, আমি কখনোই তোমার কাছে ভালো কিছু পেলাম না।
(বুখারি-১০৫২; মুসলিম-৯০৭)

স্বামীকে না রাগানো

এই বিষয়ে স্ত্রীর লক্ষ রাখা উচিত যে, স্বামী যেন তার ওপর রাগ না করেন। সেও যেন স্বামীর ওপর অভিমান করে বসে না থাকে। যদি কখনো স্বামীকে রাগিয়ে তোলে বা নিজে রাগ করে, তাহলে তার উচিত বারবার স্বামীর কাছে গিয়ে তার রাগ ভাঙানো।

রারুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَدُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا أَذَتُ أَوْ أَو ذِيَتَ ، جَاءَتْ حَتَّى تَأْخُذَ بَيْدَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ تَقُولُ وَاللَّهِ لا أُذُوقُ غُرْضًا حَتَّى تَرْضَى

তোমাদের ঐ-সকল স্ত্রী জান্নাতি যারা তাদের স্বামীদেরকে ভালোবাসে, বারবার তাদের নিকট আসে। স্বামীকে কোনো কষ্ট দিলে বা তার কারণে স্বামী কোনো কষ্ট পেলে, স্বামীর কাছে গিয়ে তার হাতে হাত রেখে বলে, তুমি রাগ না ভাঙলে আমি খাবই না।
(নাসাঈ-৫/৯১৩৯; তরবানি (ভিন্ন শব্দে)-১২/১২৪৬৮

একজন নেক মহিলা কখনোই চাইবে না, তার স্বামী তার ওপর রাগ করে থাকুক। কেননা সে জানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ : العَبْدُ الآبِيُّ حَتَّى يَرْجِعَ. وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

তিন ধরনের মানুষ এমন, তাদের ইবাদত তাদের কানকেই অতিক্রম করে না। (অর্থাৎ কবুল হয় না।) পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট ফিরে আসে। এমন মহিলা- যে তার স্বামীর সাথে রাত কাটায়, অথচ স্বামী তার ওপর নারায এবং এমন নেতা যার জাতিই তার প্রতি অসন্তুষ্ট। **১১৩**

একজন পূণ্যবতী রমণী স্বামীর উপর অভিমানী হলেও স্বামীকে ছেড়ে যায় না। শত ক্ষোভ সত্ত্বেও তার শয্যা পরিত্যাগ করে না।

(নাসাঈ-৫/৯১৩৯; তরবানি (ভিন্ন শব্দে-১২/১২৪)

স্বামীর প্রতি সদয় হতে হবে

মহিলার জন্য কর্তব্য হলো, স্বামীর ওপর দয়ার্দ্র হওয়া। প্রেমময় হয়ে নিজেকে স্বামীর জন্য শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে তোলা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَ مِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

আর এটাও আল্লাহর এক মহান নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই নিজ স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে মুহাব্বত ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।
(১১৬ আর-রুম-২১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

نِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا

তারাই জান্নাতি মহিলা যারা তাদের স্বামীদের বেশি ভালোবাসে ও বেশি সন্তান জন্ম দেয় এবং স্বামীর কাছে বারবার আসে।
(১১৫ বুখারি-৩২৩৭; মুসলিম-১৪৩৬)

সুতরাং, একজন সৎ মহিলা কথায় ও কাজে স্বামীর কাছে প্রেমময় হয়ে থাকবে। স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য এক্ষেত্রে যদি সামান্য মিথ্যাও বলতে হয়, তাতেও কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন।

স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন করতে হবে

কোনো মহিলা যদি স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য, ভালোবাসা প্রকাশের জন্য, কিংবা স্বামী যা শুনতে পছন্দ করে তার জন্য সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বানিয়ে বানিয়েও তা বলে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

নেক বিবি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য প্রকাশের মাধ্যমে স্বামীর প্রতি প্রেম নিবেদন করবে। কটুকথা বলা বা কষ্টদায়ক কোনো আচরণ তার সামনে করবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার শ্রেষ্ঠ রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:
التي تطيع زوجها اذا امر وتسره اذا نظر

যে তার স্বামী কোনো আদেশ করামাত্রই পালন করে এবং যাকে দেখামাত্রই স্বামী প্রফুল্ল হয়। (নাসাঈ-৩২৩১; হাকেম-২/২৬৮২; আহমাদ-২/২৫১; হাকেম হাদিসটিকে ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ বলেছেন। আর আলবানি এটিকে হাসান বলেছেন। আলইরওয়া-১৭৮৬; সহিহাহ-১৮৩৮।)

নেক মহিলা তো ভয়ে থাকবে, কখনো যাতে তার কথায়, কাজে, চাহনীতে কিংবা অসুন্দর বেশভূষায় স্বামী কষ্ট না পায়।

কারণ, তার প্রিয় নবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

যখন কোনো মহিলা তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতে তার অপেক্ষায় থাকা আনত-নয়না হুররা বলে, 'আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না। সে তো তোমার কাছে কিছুদিনের মেহমান। অচিরেই সে আমাদের নিকট চলে আসবে।
(তিরমিযি-১১৭৪; ইবনে মাযাহ-২০১৪; আহমাদ-৫/২৪২; ইমাম তিরমিযি এটিকে হাসান গরিব বলেছেন।)

স্বামীর ইজ্জত রক্ষা করা

স্ত্রীর কর্তব্য হলো, নিজের সতীত্ব রক্ষার মাধ্যমে স্বামীর ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা এবং স্বামীকেও সম্মানহানী কাজ থেকে বিরত রাখা। এ-ধরণের কাজে তাকে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেওয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠ রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন:

التي تطيع زوجه اذا امر وتسره اذا نظر وتحفظه في نفسها و ماله

যে তার স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্রই পালন করে এবং যাকে দেখামাত্রই স্বামী প্রফুল্ল হয় এবং যে নিজেকে ও স্বামীর সম্পদকে রক্ষা করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا ، هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

যে মহিলা স্বামীর গৃহ ছাড়া অন্য কোথাও পরিধেয় খুললো, সে যেন তার ও আল্লাহর মাঝে রক্ষিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলল।
(আবু দাউদ-৪০১০; তিরমিযি-২৮০৩; ইবনে মাযাহ-৩৭৫০; আহমাদ-৬/১৭৩; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।)

হাদিসে বর্ণিত এই প্রত্যেকটি বিষয়ই স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য। সুতরাং স্ত্রীকে এসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি, স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও পোষাক খুলতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَعَصَى إِمَامَهُ، وَمَاتَ عَاصِيًا، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّ جَتْ بَعْدَهُ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ

তিন ধরনের ব্যক্তিকে কিছুই জিজ্ঞেস করা হবে না। (অর্থাৎ, জিজ্ঞেস করা ছাড়াই তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।)

১. যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমিরের অবাধ্যতা করে এবং এ-অবস্থায় সে মারা যায়।

২. যে গোলাম মনিব থেকে পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

৩. যে মহিলার স্বামী তার থেকে অনুপস্থিত। কিন্তু তার চলার মতো যাবতীয় খরচ দিয়েছে। তারপরও সে খেয়ানত করে।
(আহমাদ-৬/১৯; আদাবুল মুফরাদ-৫৯০; ইবনে হিব্বান-১০/৪৫৫৯; আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। সহিহাহ-৫৪২)

যেই মহিলার স্বামী কাজের জন্য, তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন পুরণের জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়, সে যদি এই সুযোগে পরপুরুষের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে, কিংবা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে খেয়ানত করলো। নিশ্চয় সে মহাপাপে লিপ্ত হলো। কেননা সে স্বামীর হক ও তার সম্মান রক্ষা করেনি।

পূণ্যময়ী একজন নেক স্ত্রী সর্বদাই তার স্বামীকে রক্ষা করবে; কোনো কথা বা কাজের মাধ্যমে তাকে ফেৎনায় ফেলবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

কোনো মহিলা যেন তার স্বামীর নিকট অন্য কোনো মহিলার এমন বর্ণনা না দেয়, যাতে মনে হয় স্বামী যেন তাকে সরাসরিই দেখছে।
(১২০ বুখারি-৫২৪০.৫২৪১)

প্রিয় ভাই, একজন মহিলাকে যখন নিষেধ করা হয়েছে, সে তার স্বামীর সামনে অন্য মহিলার আলোচনা করবে না, তার গুণাগুণ তুলে ধরবে না, তারপরও কিভাবে সে তার বান্ধবীর ছবি ঘরে রাখে? মোবাইলে তার বান্ধবীর ছবি তুলে তা আবার স্বামীকে দেখায়? এমন করলে ফেৎনা তো হবেই। স্ত্রীকে যেহেতু ফেৎনার আশংকায় স্বামীর নিকট অন্য মহিলার গুণাগুণ

উপস্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে তাহলে নিঃসন্দেহে এটাও নিষিদ্ধ যে, সে স্বামীর নিকট এমন কিছু চাইবে, যা তাকে বা স্বামীকে ফেৎনায় ফেলে দেয়।

এ-কারণে অশ্লীল ম্যাগাজিন, চিত্র বা এধরণের কিছু চাওয়া তার জন্য কখনোই বৈধ হতে পারে না।

স্বামীর গোপন বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামীর গোপন বিষয়গুলোকে গোপন রাখা। দরোজার ভেতরের কথা বাইরে আলোচনা না করা।

বিশেষ করে তাদের শয্যা যাপনের কথা তো একেবারেই না। এমনকি নিজের মা, বোন বা ঘনিষ্ট বান্ধবীর কাছেও না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ألا هل عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله

সাবধান! কোনো মহিলা যেন অন্যদেরকে তার স্বামীর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত না করে; যখন তার স্বামী তার সাথে গোপনে মিলিত হয়। সাবধান! কোনো পুরুষও যেন তার স্ত্রীর গোপন বিষয়াদি অন্যদেরকে বলে না বেড়ায়; যখন সে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়।

এক নারী সাহাবি তখন দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'পুরুষ বা মহিলা সবাই তো এমনটা করে থাকে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন:

فلا تفعلوا ذلك أفلا أنبئكم ما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون

তোমরা এমনটি কোরো না। আমি কি তোমাদের এমন দুশ্চরিত্র পুরুষ আর দুশ্চরিত্র নারীর ব্যাপারে সতর্ক করব না-যারা রাস্তায় পরস্পরে মিলিত হয়, আর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে ওই ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে গোপনে মেলামেশার পর তা বলে বেড়ায়। (মুসলিম-**১৪৩৭**।)

স্বামীর ঘর ও সম্পদের হেফাজত করা

স্বামীর ঘরের হেফাজত করাও স্ত্রীর আবশ্যকীয় কর্তব্য। স্বামী অপছন্দ করে এমন কাউকে সে বাড়িতে ঢোকার অনুমতি দেবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ ، أَحَدًا تَكْرَهُونَه

তোমাদের এই অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের অপছন্দের কাউকে ঘরে বসতে দেবে না। (মুসলিম-**১২১৮**।)

তিনি আরও বলেন:

وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ حَقًّا: أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُ شَكُمْ أَحَدًا غَيْرَكُمْ ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ

স্ত্রীদের ওপর তোমাদের এই অধিকার আছে যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে তারা ঘরে বসাবে না এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতিও দেবে না। (তিরমিযি-**১১৬৩**; ইবনে মাজাহ-**১৮৫১**; ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে হাসান, সহিহ বলেছেন।)

স্ত্রীর জন্য আবশ্যক হলো, স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা। তার অনুমতি ব্যতীত তা থেকে খরচ না করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রেষ্ঠ রমণীর গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

وتحفظه في نفسها وماله

যে নিজেকে ও স্বামীর সম্পদকে হেফাজত করে।

তিনি আরও বলেন:

لا يحل لا مرأة أن تعطى من مال زوجها شيئا إلا بإذنه

কোনো মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে কাউকে কিছু দেওয়া জায়েয নেই।

যদি সে স্বামীর অনুমতিক্রমে প্রয়োজনমতো খরচ করে, তাহলে উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ

যদি কোনো নারী ঘরের খাবার থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে, তাহলে তাকে তার ব্যয়ের কারণে ও স্বামীকে তার উপার্জনের কারণে পুরস্কৃত করা হবে।
(বুখারি-২০৬৫; মুসলিম-১০২৪)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনত্র আরও বলেন:

إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا

স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ক্রমে তার ঘর থেকে কিছু সদকা করে, তাহলে সে ও তার স্বামী সম্পদের রক্ষকের সমপরিমাণ সওয়াব হবে। কারও থেকে কারও সওয়াব কম হবে না বা কারো অংশ থেকে কমানো হবে না।
(আহমাদ-৬/৯৯; নাসাঈ-২৫৩৯; তিরমিযি-৬৭১; তিনি এই হাদিসকে হাসান বলেছেন)

উলামায়ে কেরাম বলেন, স্বামীর সম্পদ থেকে খরচ করার ৩ টি ধরণ রয়েছে। যথা:

১. স্বামী তার স্ত্রীকে খরচ করার বিশেষ অনুমতি দিয়ে রেখেছে। এমতাবস্থায়, স্বামী-স্ত্রী উভয়ই পূর্ণ প্রতিদান পাবে।

২. অথবা স্বামী স্ত্রীকে সাধারণভাবে একটা খরচ করার অনুমতি দিয়েছে। এক্ষেত্রে উভয়ই ভাগাভাগি প্রতিদান পাবে।

৩. স্বামীর পক্ষ থেকে অনুমতি নেই। তবুও স্ত্রী যদি খরচ করে, তাহলে এ-সম্পদ স্বামীর হওয়ার কারণে স্বামী তো সওয়াব পাবে, কিন্তু স্ত্রী পাপের ভাগিদার হবে। (আল্লাহর কাছ থেকে পানাহ চাই)

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা না রাখা

স্বামীর উপস্থিতিতে, স্ত্রী তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

কোনো নারীর জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যাতীত নফল রোযা রাখা জায়েয নেই।(বুখারি-৫১৯৫; মুসলিম-১০২৬)

স্বামীর ভুলগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া, তার যত্ন নেওয়া

একজন পূণ্যময়ী রমণীর উচিত, স্বামীর অধিকার সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত হওয়া। স্বামীর ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা করা। তার ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া। স্বামীর পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সম্মান করা। গৃহ পরিস্কার রাখা। স্বামী তার কাছে আসতে চাইলে তাকে কাছে টেনে নেওয়া। আদর সোহাগে তার সবকিছুতেই প্রেমের খুশবু ছড়িয়ে দেওয়া। খাবারের সময় যত্ন নেওয়া। ঘুমের সময় ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। স্বামীকে রাগান্বিত দেখলে তাকে জ্বালাতন না করা।

কবি কত সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন:

فيأباك قلبي، والقلوب تتقلب فاني رايت الحب في القلب والأذي اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهبخذي العفو، مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في ثورتي، حين أغضب ولا تنقريني نقرك الدف مرة فانك لا تدرين كيف المغيب ولا تكثري الشكوي فتذهبي بالهوى

فيأباك قلبي، والقلوب تتقلب فاني رايت الحب في ال والأذي اذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب
ক্ষমা নিয়ো, নিয়ো অবিরাম প্রেম। যদি রেগে যাই করো না চিৎকার নাকাড়ায় আর তুড়ি মেরো না-জানো না তুমি, মুগাইয়াব কী রকম লোক। অভিযোগ যা কিছু আছে থাকুক জমা, যাবে তুমি? নিয়ে যাও প্রেম। ফিরে যাবে হৃদয় আমার তোমার দিকেই হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে যাওয়া হৃদয় তো এমনই। আমি দেখেছি, একটি হৃদয়ে যখন দ্রোহ আর ভালোবাসা এক হতে শুরু করে, সেখানে তখন

থাকে না প্রেম-পালায় বহুদূর।

নারীদের ক্ষেত্রে এটাই হলো ইসলামের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলাম স্বামী ও তার হকের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। যদি কোনো নারী এগুলো মানতে পারে, তাহলে অবশ্যই তার ঘরে অনাবিল শান্তি বিরাজ করবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অধিকাংশ নারীই আজ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই নিত্য বেড়ে চলছে তালাক, মারধর, মনোমালিন্য আর ঝগড়াঝাটির মতো অপ্রীতিকর কাজগুলো।

আমাদের কানে তো এমন নারীদের কথাও আসে, যারা তাদের স্বভাবজাত কোমলতা ও নারীসুলভ আচরণ ভুলে গিয়ে জালিম শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দুর্বল স্বামীর ওপর হুকুমের ছড়ি ঘোরায় এবং নানানভাবে তাকে নির্যাতন করে।

স্বামী তাকে কিছু দিতে পারলে তো খুশিই, না দিতে পারলে সে স্বামীকে অক্ষম, ফকির বলে গালিগালাজ করে। ঘরে আসলে স্বামীর গালে থাপ্পর দেয়। বের হওয়ার সময় পেছন থেকে ধাক্কা মারে।
এই নারী স্বামীর যা আছে তা নিয়ে পরিতুষ্ট না হয়ে সবদিক থেকে তাকে অতীষ্ট করে তোলে। পরপুরুষের সামনে নিজেকে অবারিত করে। স্বামীর সাথে যখনই কথা বলে, কথার ধরন হয় এই এমন-

'অমুক মহিলার স্বামী তার জন্য এই করেছে, সেই করেছে। তাকে এটা দিয়েছে, ওটা দিয়েছে আর আমারই পোড়া কপাল।'

'কত ভালো ভালো ঘর এসেছিল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। এই ঘরই আমার ভাগ্যে জুটল।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে স্বামীর সাথে ঘরে থাকা অবস্থায় নিজেকে বন্দি মনে করে। সাজসজ্জা, খুশবু পরিত্যাগ করে, উস্কো চুল, ময়লা কাপড় নিয়ে এমনভাবে থাকে, যা বরাবরই স্বামীকে কষ্ট দেয়। আবার এই মহিলাই যখন বাইরে যায়, তখন তার বেশভুষা হয় মোহনীয়।

এই হতভাগ্য নারী মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ সাজে। অথচ স্বামীর কাছে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

বন্ধুদের সাথে বাইরে গেলে তার আবেদনময়ী কথা ঝরে ঝরে পড়ে। পার্টিকে জমিয়ে রাখে। আর ঘরে ফিরলেই সে হয়ে যায় সিংহের মতো। কথায় যেন আগুন ঝরে। কাজে অপমান করে। এই মহিলা আসলেই হতভাগা। তার মধ্যে স্বামীর জন্য কোনো কল্যাণ নেই।

আচ্ছা বলুন তো, এমনটা হলে পরিবারে সুখ কিভাবে আসবে?

যে নারী তার ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করছে, তার প্রভুকে ক্রোধান্বিত করছে, স্বামীকে অসুখী করছে; কিভাবে সে সুখের আশা করতে পারে?

এখনও সময় আছে সুপথে ফিরে আসার।

রাসূল (সা.) ও সাহাবিদের দাম্পত্য জীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের দাম্পত্য জীবন ছিল এক অনন্য আদর্শ, যা মানবজীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক—পরিবার ও বিবাহিত জীবনের সৌন্দর্য ও ভারসাম্য—কে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করে। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল প্রেম, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহভীতির সমন্বয়ে গঠিত, যা আজকের যুগেও একটি আলোকবর্তিকা হয়ে আছে।

রাসূল (সা.)-এর দাম্পত্য জীবন শুরু হয় খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে, যিনি ছিলেন একজন জ্ঞানী, ধনী এবং অভিজ্ঞ নারী। তিনি রাসূল (সা.)-কে সবসময় ভালোবাসা, সমর্থন এবং নিরাপত্তা দিয়েছেন। নবুওয়তের শুরুর কঠিন সময়গুলোতে খাদিজা (রা.)-ই তাঁর সবচেয়ে বড় মানসিক শক্তি ছিলেন। তাঁদের সংসার ছিল দাম্পত্য প্রেম ও সহযোগিতার এক মূর্ত প্রতীক। খাদিজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর রাসূল (সা.) কয়েকজন নারীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহগুলো নিছক ব্যক্তিগত সুখের উদ্দেশ্যে নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীদের নিরাপত্তা, ইসলাম প্রচার ও রাজনৈতিক বা সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল। প্রত্যেক স্ত্রীকে তিনি সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন এবং তাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। আয়েশা (রা.)-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই আন্তরিক ও স্নেহপূর্ণ। রাসূল (সা.) তাঁর সঙ্গে হাসি-তামাশা করতেন, কখনো কখনো দৌড় প্রতিযোগিতাও করতেন। তিনি বলতেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে, আর আমি আমার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করি।”

রাসূল (সা.)-এর দাম্পত্য জীবনে ছিল পরিপূর্ণ ভারসাম্য। তিনি একাধারে নবী, রাসূল, শাসক ও নেতা হলেও, সংসারে একজন সাধারণ স্বামী হিসেবে কাজ করতেন। তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, গোছগাছ করতেন এবং স্ত্রীদের কাজেও সাহায্য করতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে তিনি সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন, কখনো ক harsh ভাষায় কিছু বলতেন না। যখন কোনো মতবিরোধ হতো, তিনি ধৈর্যের সঙ্গে তা সমাধান করতেন। তাঁর জীবনে স্ত্রীদের প্রতি কোনো অবিচার, অপমান বা মানহানির ঘটনা পাওয়া যায় না।

সাহাবিরাও রাসূল (সা.)-এর এই আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে তাদের পারিবারিক জীবন গঠন করেছিলেন। আবু বকর (রা.) তাঁর কন্যা আয়েশা (রা.)-কে ধর্মীয় জ্ঞানে গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজ পরিবারে ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবনযাপন করতেন। উমর (রা.) কঠোর ও দৃঢ়চেতা হলেও স্ত্রীর প্রতি সহনশীল ছিলেন। একবার যখন একজন লোক তাঁর স্ত্রীর অভিযোগ করতে এসেছিল, তিনি নিজেই বলেছিলেন যে স্ত্রীদের অনেক দায়িত্ব ও পরিশ্রম আমরা বুঝতে পারি না—তাদের দয়া ও শ্রদ্ধা করা উচিত। উসমান (রা.) ছিলেন ভদ্র ও লজ্জাশীল স্বামী, স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অতি নম্র। আর আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-র সংসার ছিল এক আদর্শিক দাম্পত্য জীবনের নমুনা। তারা পরস্পরের কাজ ভাগ করে নিতেন এবং আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার ভিত্তিতে সংসার চালাতেন।

রাসূল (সা.) ও সাহাবিদের দাম্পত্য জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়, একটি সুন্দর দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা, ধৈর্য, আল্লাহভীতি ও দায়িত্ববোধ। স্ত্রীকে বন্ধু, পরামর্শদাতা ও জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শ স্বামী হওয়ার নিদর্শন। আজকের সমাজে পারিবারিক সংকট ও দাম্পত্য দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আমাদের উচিত এই পবিত্র আদর্শগুলোর অনুসরণ করা—যেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের বোঝা নয়, বরং একে অন্যের সেরা সহযোগী ও আশ্রয়।

সাহাবিদের দাম্পত্য জীবন থেকে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা তুলে ধরলে ইসলামী পারিবারিক জীবনের আদর্শ আরও স্পষ্ট হয়। তাঁদের জীবনে যেমন ছিল গভীর ভালোবাসা, তেমনি ছিল ত্যাগ, ধৈর্য ও ইসলামি নীতির দৃঢ় অনুশীলন।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আলী (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-র সংসারজীবন। তারা ছিলেন নবীজির ঘনিষ্ঠ পরিবারভুক্ত, কিন্তু তাদের জীবনে ছিল না আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য। ফাতিমা (রা.) নিজ হাতে ঘরের কাজ করতেন—আটা পিষতেন, পানি আনতেন, চুলা ধরাতেন। একদিন ফাতিমা (রা.) বাবার কাছে গিয়ে গৃহকর্মে সহায়তার জন্য একজন দাসী চাইলেন। রাসূল (সা.) তাঁদের তা না দিয়ে বললেন, "তোমরা ঘুমাতে যাওয়ার আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলো। এতে তোমরা দাসীর চেয়েও বেশি সাহায্য পাবে।" এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সাহাবিদের পরিবারে দৈহিক কষ্ট থাকলেও তাতে দাম্পত্য ভালোবাসা ও আত্মিক শান্তি নষ্ট হয়নি, বরং তারা সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতেন।

আরেকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হলো খাব্বাব ইবনে আরত (রা.)-এর পরিবার। তিনি ছিলেন এক সময়ের দাস, পরে ইসলামের আলোকে আলোকিত সাহাবি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন একাধারে সাহসী ও ধর্মপ্রাণ। একবার তিনি দীর্ঘ সময় যুদ্ধের জন্য বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন স্ত্রী তাঁর টাকা-পয়সা ব্যয় করেছেন গরিবদের মাঝে। তিনি একটুও রাগ করেননি, বরং খুশি হয়েছিলেন যে তাঁর স্ত্রী সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। এখানেই বোঝা যায়—সাহাবিদের দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক আস্থা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কতটা শক্তিশালী ছিল।

এক সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ছিলেন খুব গরিব। তাঁর স্ত্রী যয়নব (রা.) ঘরের খরচ চালাতে গিয়ে দেখলেন, স্বামীর উপার্জন খুব অল্প। তিনি স্বামীকে না জানিয়েই কিছু অর্থ দান করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ বিষয়ে দ্বিধায় পড়ে তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছে জানতে যান—এ কাজ কি জায়েজ? রাসূল (সা.) বলেন, "তোমার স্বামী ও সন্তানদের প্রতি যা ব্যয় করছো, সেটাও সদকা।" এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সাহাবিদের স্ত্রীদের দানশীলতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল দ্বীনদারীর ক্ষেত্রেও সতর্কতা এবং স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ সম্মানবোধ।

এছাড়া সাহাবিদের জীবনে পারিবারিক কলহের ক্ষেত্রেও ছিল চমৎকার ধৈর্য ও সংযমের দৃষ্টান্ত। একবার উমর (রা.)-এর স্ত্রী তাঁকে কিছু নিয়ে অভিযোগ করছিলেন। ঠিক তখন এক লোক তাঁর কাছে স্ত্রী নিয়ে অভিযোগ জানাতে এলে উমর (রা.) বললেন, "সে আমার সন্তানদের জননী, সে আমার জন্য রান্না করে, কাপড় ধোয়, ঘর পরিষ্কার করে; আমি কীভাবে তার সঙ্গে রূঢ় হতে পারি?" এই উত্তর শুনে লোকটি লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল। উমর (রা.)-এর এভাবে স্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ তাঁর চরিত্রের মহানতা ও ইসলামের নারীনীতির সৌন্দর্য তুলে ধরে।

এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবিদের দাম্পত্য জীবন ছিল শুধু দেহগত নয়, বরং আত্মিক, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে গঠিত। তারা শুধু ভালোবাসা নয়, বরং দায়িত্ব, আত্মত্যাগ ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেও বৈবাহিক জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতেন। তাঁদের জীবনে রাগ, অভাব, যুদ্ধ কিংবা মানসিক চাপ কখনো সম্পর্ককে দুর্বল করতে পারেনি, বরং দ্বীনের ভিত্তিতে তা আরও দৃঢ় হয়েছিল। এইসব অনন্য আদর্শ আজকের মুসলিম দাম্পত্য জীবনের জন্য এক অনুকরণীয় শিক্ষা।

সন্তান, পরিবার ও দায়িত্ববোধ

কুরআন ও হাদিসের আলোকে সন্তান প্রতিপালনে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ ভূমিকা

ইসলামে সন্তান প্রতিপালনকে এক মহান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত একটি আমানত। এই দায়িত্ব কেবল একজন অভিভাবকের ওপর নয়, বরং স্বামী ও স্ত্রী—উভয়ের ওপরই ন্যস্ত। কুরআন ও হাদিসে বহু স্থানে সন্তানদের সুশিক্ষা, সদাচরণ ও দ্বীনি মূল্যবোধে গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সন্তান প্রতিপালনে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকা পরস্পর পরিপূরক, যেখানে উভয়কে দায়িত্বশীল, সচেতন ও আল্লাহভীরু হতে বলা হয়েছে।

কুরআনের আলোকে, সন্তান প্রতিপালনে যৌথ দায়িত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় সূরা তাহরিমে—
“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো।” (সূরা তাহরিম: ৬)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও দায়িত্ব। সন্তানের ঈমান, চরিত্র, আদব-কায়দা ও নৈতিকতাকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলার কাজটি উভয়কেই করতে হবে। পিতা-মাতা উভয়েই সন্তানকে হালাল-হারামের জ্ঞান, দ্বীন ও দুনিয়ার ভারসাম্য এবং মানুষের প্রতি সদাচরণ শেখাবেন।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,
“তোমাদের প্রত্যেকে একজন রাই’ (অভিভাবক), এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রাই’, এবং নারীও তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে রাই’।” (বুখারি ও মুসলিম)
এই হাদিসে পরিবার পরিচালনার দায়িত্বকে যৌথভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। পিতা যেমন সন্তানদের উপার্জন, সুশিক্ষা ও সুরক্ষা প্রদান করবেন, তেমনি মাতা হবে ভালোবাসা, আদর্শ ও প্রথম শিক্ষালয়।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে, সন্তানের মানসিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য পিতা-মাতার পারস্পরিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতা সন্তানকে নামাজ, রোজা, সত্যবাদিতা ও সামাজিক

আচরণের দীক্ষা দেবেন, আর মাতা ঘরে বসেই তার হৃদয়ে আল্লাহভীতি, ধৈর্য ও পরিশুদ্ধতা গেঁথে দেবেন। একথা বলা হয়ে থাকে—“মায়ের কোলই সন্তানের প্রথম মাদরাসা।” কিন্তু এই “মাদরাসা” তখনই পূর্ণতা পায় যখন পিতাও সে শিক্ষার ধারক হন।

সন্তানের শৈশব থেকে কৈশোর এবং যৌবন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পিতা-মাতার ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা থাকে। শিশুকালে মাতৃস্নেহ সন্তানের আত্মবিশ্বাস ও স্থিতি গড়ে তোলে, আর পিতার নির্দেশনা ও চরিত্র সন্তানের আদর্শ তৈরি করে। রাসূল (সা.) নিজেও হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে কাঁধে তুলে খেলা করতেন, আদর করতেন, নামাজে থাকলেও তাঁদের ডাকে সাড়া দিতেন—এগুলো সন্তান প্রতিপালনে পিতার সরাসরি অংশগ্রহণের স্পষ্ট উদাহরণ।

পাশাপাশি, মা-ও সন্তানের জন্য কেবল খাদ্য বা পোশাকের দায়িত্ব নেন না, বরং তাঁদের আত্মিক, নৈতিক ও ধর্মীয় বিকাশে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখেন। হযরত উম্মে সুলায়ম (রা.)-এর ঘটনা স্মরণযোগ্য, যিনি তাঁর ছেলে আনাস (রা.)-কে নিজ হাতে নবীজির খিদমতে দিয়ে দ্বীনি শিক্ষায় বড় করে তুলেছিলেন।

ইসলামে সন্তান প্রতিপালন একক দায়িত্ব নয়—বরং স্বামী-স্ত্রীর একত্র প্রচেষ্টায় সন্তানের হৃদয়ে দ্বীন, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলি গড়ে তোলা হয়। পিতামাতা যদি পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে, ভালোবাসা ও ধৈর্যের মাধ্যমে সন্তানকে গড়ে তোলেন, তবে সেই সন্তান শুধু পরিবারের গর্ব নয়, সমাজ ও উম্মাহর জন্যও একটি আশীর্বাদ হয়ে ওঠে।

অতএব, কুরআন ও হাদিস আমাদের শেখায়—সন্তান আল্লাহর দেওয়া একটি পরীক্ষাও বটে, যা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, দ্বীনী জ্ঞান, দয়া ও সচেতনতা থাকা আবশ্যক। তবেই আমরা সত্যিকার অর্থে এই মহান দায়িত্ব পালনে সফল হতে পারি।

নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষা

সন্তান প্রতিপালনে নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন শিশু যেমন শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠে খাদ্য ও যত্নের মাধ্যমে, তেমনি আত্মিক ও চারিত্রিকভাবে গড়ে ওঠে নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধের মাধ্যমে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে, সন্তান মানুষ করাকে শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং একটি ইবাদত ও আখিরাতের পুঁজি হিসেবে দেখা হয়। একজন সন্তান যদি সঠিক নৈতিকতা ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তবে সে নিজে শুধু একজন ভালো মানুষ হয় না, বরং পরিবার, সমাজ এবং পুরো উম্মাহর জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের শোভা; তবে স্থায়ী নেক আমল হলো তোমার প্রতিপালকের নিকট উত্তম প্রতিদান ও আশার দিক থেকে উত্তম।" (সূরা কাহফ: ৪৬)
এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সন্তান কেবল পার্থিব সৌন্দর্য নয়, বরং তাদের নেক আমলে গড়া উচিত। আর এই নেক আমলের ভিত্তিই হলো নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষা।

নৈতিক শিক্ষা একটি শিশুর হৃদয়ে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস, সম্মানবোধ, দায়িত্ববোধ ও মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করে। আর ইসলামি শিক্ষা তাকে আল্লাহভীরু, নামাজি, ধৈর্যশীল, সৎ ও আত্মনিয়ন্ত্রিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমাদের প্রত্যেকে একজন অভিভাবক এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

এই হাদিসে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব হলো—সন্তানের আত্মা ও চরিত্রকে এমনভাবে গড়েপিটে তোলা, যাতে সে আল্লাহভীরু হয় এবং সমাজে ন্যায় ও শান্তির ধারক হয়ে ওঠে।

শিশুদের মানসিকতা থাকে কোমল ও গ্রহণযোগ্য। এই সময়ে যদি তাদেরকে কুরআনের শিক্ষা, রাসূল (সা.)-এর আদর্শ, আদব-কায়দা ও দ্বীনের মূলনীতিগুলো শেখানো হয়, তাহলে তা তাদের হৃদয়ে গভীরভাবে গেঁথে যায়। তারা ছোটবেলা থেকেই নামাজ, রোজা, দয়া, দান,

ধৈর্য, সহনশীলতা, পরোপকারের শিক্ষা পায়। এতে করে তারা বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

বর্তমান যুগে যখন নানাবিধ মিডিয়া, প্রযুক্তি ও ভোগবাদী চিন্তা শিশুদের নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে, তখন পারিবারিকভাবে ইসলামি মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। বাবা-মা যদি ঘরে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করেন, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন, নবীজির জীবনী পড়ান, এবং নিজেরাও আচার-আচরণে ইসলাম অনুসরণ করেন, তাহলে সন্তানরা খুব সহজেই সেসব গ্রহণ করে।

আবার হাদিসে রাসূল (সা.) বলেন:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের আদেশ দাও সাত বছর বয়সে।" (আবু দাউদ)

এই হাদিসে একটি নির্দিষ্ট বয়সে ইসলামী চর্চা শুরু করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি ছোটবেলাতেই স্থাপন করতে হবে। তবেই শিশু বড় হয়ে এমন ব্যক্তি হবে, যে আল্লাহর ভয় রাখে, মানুষের হক আদায় করে, সমাজে ন্যায়ের পক্ষে থাকে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, নৈতিক ও ইসলামি শিক্ষা ছাড়া সন্তানের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ অসম্ভব। শুধু স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বা পেশাগত প্রশিক্ষণ নয়—তাদের জীবনকে অর্থবহ ও শান্তিময় করতে হলে পিতামাতাকে দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ, সন্তানকে একজন সৎ ও ধার্মিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই হলো সত্যিকার অর্থে একজন মুসলিম অভিভাবকের সফলতা।

আধুনিক সমাজ ও দাম্পত্য জীবন

আধুনিক সমাজে দাম্পত্য জীবন একদিকে যেমন নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে, তেমনি নানা চ্যালেঞ্জ ও জটিলতারও শিকার হচ্ছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি, জীবনযাত্রার গতি, নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব, এবং ভোগবাদী চিন্তাভাবনার বিস্তার—এসবই দাম্পত্য জীবনের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ফেলছে।

আগে পরিবার ছিল একটি ঘনিষ্ঠ সামাজিক একক, যেখানে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নির্ভর করত পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও আত্মত্যাগের উপর। কিন্তু আধুনিক সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, পারিবারিক বন্ধন অনেক সময় দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। মানুষ 'আমি'কে এত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে 'আমরা' শব্দটা দাম্পত্য জীবন থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে ছোটখাটো বিষয়েও দূরত্ব, দাম্পত্য কলহ, এমনকি বিচ্ছেদ বেড়ে যাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একদিকে যেমন মানুষের যোগাযোগ সহজ করেছে, তেমনি তা অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাস, অপারিপক্কতা ও অতিরিক্ত প্রত্যাশার জন্ম দিচ্ছে। স্বামী বা স্ত্রী কেউ যদি অনলাইন আসক্তিতে ভোগে বা অন্যের সঙ্গে তুলনা করতে থাকে, তাহলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

আবার কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীদের ক্ষেত্রে সময়ের অভাবও একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা একসঙ্গে সময় কাটাতে পারে না, একে অপরকে বোঝার সুযোগ কমে যায়। এতে করে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যা ধীরে ধীরে সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তবে দাম্পত্য জীবনের এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে আশার আলোও রয়েছে। অনেক দম্পতি এখন আরও শিক্ষিত, সচেতন ও মানসিকভাবে সমৃদ্ধ। তারা বুঝতে পারছে, একটি সফল দাম্পত্য জীবন কেবল অর্থ, সৌন্দর্য বা সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না; বরং ভালোবাসা, সহনশীলতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, দায়িত্ববোধ ও দীনদার মনোভাবের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দাম্পত্য জীবন হলো একটি পবিত্র বন্ধন, যা কেবল দুনিয়াবি প্রয়োজন নয়, বরং আখিরাতের সফলতার সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে—

“তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হলো—তিনিই তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” (সূরা রূম: ২১)
এই আয়াতের আলোকে বোঝা যায়, দাম্পত্য জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো “সাকীনাহ” বা মানসিক প্রশান্তি, যা কেবল ভালোবাসা ও দয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

আধুনিক দাম্পত্য জীবনে ইসলামী আদর্শ যেমন—আদব, পর্দা, সহমর্মিতা, দায়িত্বশীলতা ও আল্লাহভীতি—জীবিত রাখলে পারিবারিক শান্তি অর্জন সম্ভব। সময়, প্রযুক্তি ও জীবনধারার পরিবর্তন হবেই; কিন্তু সম্পর্কের ভিত্তি যদি মজবুত হয়, তবে কোনো পরিবর্তনই তা ভাঙতে পারে না।

মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব

আধুনিক দাম্পত্য জীবনে মিডিয়া ও প্রযুক্তির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ও জটিল। একদিকে এগুলো আমাদের জীবনকে সহজতর করেছে—দূরে থেকেও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছেন, ভিডিও কল বা মেসেজের মাধ্যমে অনুভূতির আদান-প্রদান সহজ হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে, এই প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারসাম্য না থাকলে তা দাম্পত্য জীবনে দূরত্ব, অবিশ্বাস ও মানসিক ক্লান্তির সৃষ্টি করছে। বর্তমানে দেখা যায়, অনেক দম্পতি দিনের বড় একটি সময় ব্যস্ত থাকেন স্মার্টফোন, টিভি বা সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায়। একই ঘরে থেকেও তারা একে অপরের সান্নিধ্য বা হৃদ্যতা উপভোগ করতে পারেন না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা টিকটক—মানুষের জীবনে একধরনের ‘তুলনামূলক জীবন’ তৈরি করছে। অন্যদের সুখের ছবি দেখে নিজের দাম্পত্য জীবন নিয়ে হতাশা তৈরি হয়। স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি অন্যের পোস্টের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী হন বা সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠেন, তবে দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাস ও কলহ জন্ম নেয়। আবার, অনেকে ভার্চুয়াল জগতে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে চ্যাটিং বা বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন, যা ধীরে ধীরে দাম্পত্য সম্পর্কের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়।

আরও গভীর সমস্যা হলো ইন্টারনেটে অশ্লীল কনটেন্টের সহজলভ্যতা। অনেক মানুষ, না চাইলেও, এসব কনটেন্টের জালে আটকা পড়ে যান। ফলস্বরূপ, স্বামী বা স্ত্রী কারও মধ্যে

যৌন অস্বাভাবিকতা, উদাসীনতা বা বিকৃত আসক্তি জন্ম নেয়, যা দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও মানসিক শান্তিকে নষ্ট করে দেয়। আবার কেউ কেউ সঙ্গীর ফোন, চ্যাট বা অ্যাকাউন্টে নজরদারি করে নিজেদের মধ্যে সন্দেহ ও অভিযোগের দেয়াল তৈরি করে ফেলেন। অথচ একটি দাম্পত্য জীবনের মূলভিত্তিই হওয়া উচিত পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মান।

এই প্রেক্ষাপটে করণীয় হলো—দম্পতিকে নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহারে একটি যৌথ বোঝাপড়ায় পৌঁছাতে হবে। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় যেন স্মার্টফোন বা স্ক্রিনের পেছনে না হারিয়ে যায়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। একে অপরের সঙ্গে প্রতিদিন কিছুটা নিরবচ্ছিন্ন সময় কাটানো, পারস্পরিক অনুভূতি ভাগাভাগি করা, একসাথে ধর্মীয় বা ইতিবাচক কনটেন্ট দেখা কিংবা ঘরের বাইরে সময় কাটানো—এসব ছোট ছোট চর্চা সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলে। সেই সঙ্গে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে আল্লাহভীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। কারণ প্রযুক্তি কোনো পক্ষ নেয় না—এটি যেমন নেক আমলের মাধ্যম হতে পারে, তেমনি অনৈতিকতার দরজাও খুলে দিতে পারে। ইসলাম আমাদের শেখায় আত্মসংযম, পরস্পরের হক আদায় এবং দাম্পত্য জীবনকে ইবাদতের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করতে।

অতএব, দাম্পত্য জীবনে মিডিয়া ও প্রযুক্তিকে শত্রু নয়, বরং একটি নিয়ন্ত্রিত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তখন প্রযুক্তি হবে না সম্পর্কভাঙার কারণ, বরং হবে সম্পর্কের একটি সুন্দর সহায়ক শক্তি।

নারী অধিকার ও স্বাধীনতা

নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা—এই দুটি বিষয় আধুনিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত সামাজিক ও নৈতিক ইস্যুগুলোর অন্যতম। এগুলোর প্রতিফলন দাম্পত্য জীবনেও গভীরভাবে পড়ছে। ইসলাম নারীকে যেমন মর্যাদা দিয়েছে, তেমনি স্বাধীনতার মধ্যেও দায়িত্ববোধ ও ভারসাম্যের শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার ধারণাটি অনেক সময় ভুলভাবে উপস্থাপিত ও প্রয়োগ হচ্ছে, যার ফলে দাম্পত্য জীবনে একধরনের টানাপোড়েন, মানসিক দূরত্ব এবং দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে।

আধুনিক নারীরা আজ শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ও সমাজে ব্যাপকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। তারা শুধু ঘর নয়, দেশ ও সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে উঠছে। কিন্তু এই উন্নয়ন যদি পারিবারিক দায়িত্ব ও সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে, তবে তা দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয়। অনেক সময় দেখা যায়, নারীরা "স্বাধীনতা" শব্দটির অপব্যাখ্যা করে স্বামী বা পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ উপেক্ষা করতে শুরু করেন। আবার অন্যদিকে, কিছু পুরুষ এখনো নারীর স্বাধীনতাকে হুমকি হিসেবে দেখেন, এবং তাদের অধিকারকে সীমিত করার চেষ্টা করেন। এই দ্বিমুখী মানসিকতা দাম্পত্য জীবনকে করে তোলে সংঘাতপূর্ণ ও অস্থির।

ইসলাম নারীর অধিকারে যেমন বলেছে—নারী স্বামীকে ভালোবাসবে, সহযোগিতা করবে, পরিবারকে সময় দেবে, তেমনি পুরুষের প্রতিও দায়িত্ব দিয়েছেন—তিনি স্ত্রীর মর্যাদা রক্ষা করবেন, তার মতামতকে মূল্য দেবেন, এবং তার স্বাধীনতাকে সম্মান করবেন। কুরআনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে "মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহ" বা ভালোবাসা ও দয়ার সম্পর্ক বলা হয়েছে। অর্থাৎ, নারী যদি তার অধিকার ও স্বাধীনতাকে পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগ করেন, এবং পুরুষ যদি নারীর মর্যাদা ও মতামতকে সম্মান করেন, তাহলে দাম্পত্য জীবন আরও সুদৃঢ় হয়।

কিন্তু সমস্যার সূচনা তখনই হয় যখন স্বাধীনতা হয়ে ওঠে কর্তৃত্বের হাতিয়ার, কিংবা অধিকারের দাবি চলে আসে পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ওপরে। তখন স্ত্রী স্বামীকে প্রতিপক্ষ মনে করেন, এবং স্বামী স্ত্রীর স্বাধীনতাকে ভয় পান। এটি শুধু মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে না, বরং সন্তানের সামনে একটি দ্বিধাগ্রস্ত পারিবারিক চিত্র উপস্থাপন করে, যার প্রভাব পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক ও মানসিক গঠনে।

সুতরাং, নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা দাম্পত্য জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যদি তা আসে ইসলামি নৈতিকতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। নারী যদি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তার মত প্রকাশ করেন, এবং পুরুষ যদি স্ত্রীর চিন্তা ও স্বাধীনতাকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেন, তবে তা সম্পর্কের শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলে। স্বাধীনতা মানে দায়িত্ব এড়ানো নয়, বরং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া। অধিকার মানে দাবিদাওয়া নয়, বরং একে অপরকে সম্মান করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিই দাম্পত্য জীবনকে করে তোলে সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপযোগী।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী যেমন দাম্পত্য জীবনে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন, তেমনি দায়িত্বশীল জীবনও পালন করেছেন। একজন মুসলিম নারী ছিলেন সম্মানিত, সাহসী, প্রজ্ঞাবান ও কর্তব্যপরায়ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছিলেন নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর স্ত্রীগণ ছিলেন জ্ঞানী, মত প্রকাশে স্বাধীন এবং সমাজে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.)-এর উদাহরণ নিলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী নারী। বিয়ের পরও তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব হারাননি, বরং রাসূল (সা.)-এর জীবনের অন্যতম শক্তি হয়ে উঠেছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতেন, তাঁর রিজিক উপার্জনকে সম্মান করতেন। দাম্পত্য জীবনের এমন ভারসাম্যপূর্ণ উদাহরণ আধুনিক সমাজে অনুপম অনুকরণীয়।

হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তীক্ষ্ণ স্মৃতি সম্পন্ন এবং ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞ। তিনি শুধু রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী নন, বরং একজন বিশিষ্ট ফকিহ ও হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবেও পরিচিত। দাম্পত্য জীবনে তিনি যেমন ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতার প্রতীক ছিলেন, তেমনি মতামত ও বক্তব্য প্রকাশেও ছিলেন স্বাধীন ও সম্মানিত। রাসূল (সা.) তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তাঁর রাগ-অভিমানকে গুরুত্ব দিতেন, এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করতেন।

এছাড়াও সাহাবিয়াতদের মধ্যে হযরত উম্মে সুলায়ম (রা.), হযরত ফাতিমা (রা.), এবং হযরত উম্মে সালামা (রা.) দাম্পত্য জীবনে যে সহনশীলতা, দায়িত্বশীলতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেখিয়েছেন—তা আজকের দাম্পত্য জীবনের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা পারিবারিক

দায়িত্বে যেমন কুশলী ছিলেন, তেমনি ইসলামের সামাজিক পরিসরে ছিলেন জাগ্রত, সৎ ও আত্মমর্যাদাশীল নারী।

এইসব দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে, ইসলাম নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে কখনো দমন করেনি, বরং তাকে সম্মান ও ভারসাম্যের মাধ্যমে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে। তবে এই স্বাধীনতা ছিল দায়িত্বপূর্ণ, মার্যাদাসম্মত ও দাম্পত্য সম্পর্কের সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহে গঠিত।

আজকের সমাজে নারী স্বাধীনতার নামে যদি পরিবারকে অবহেলা করা হয়, অথবা পুরুষ যদি নারীর উন্নয়নকে হিংসার চোখে দেখে, তবে তা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামগ্রিকভাবে পরিবার ও সমাজকে ভেঙে ফেলতে পারে। এজন্য ইসলামের ভারসাম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই হওয়া উচিত আমাদের অনুকরণীয়—যেখানে নারীর অধিকার মানে আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা মানে দায়িত্ব, আর দাম্পত্য সম্পর্ক মানে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা।

বিচ্ছেদ ও তালাক

বিচ্ছেদের কারণ ও সমাধানমূলক চেষ্টা

দাম্পত্যজীবনে সবচেয়ে স্পর্শকাতর একটি বিষয় হচ্ছে তালাক। এ বিষয়ে প্রত্যেক দম্পতিকে চূড়ান্ত সতর্ক থাকা অপরিহার্য। আমাদের সমাজে তো ঠুনকো মনোমালিন্যের জেরে অনেক দম্পতি তালাক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিংবা সাময়িক দাম্পত্য-কলহে ক্ষুব্ধ হয়ে তালাক দিয়ে বসে। অথচ আলিমগণের ভাষ্য হলো-অতীব প্রয়োজন (যা শরীয়তে ওজর বলে গণ্য) ছাড়া স্বামীর জন্য যেমন তালাক দেওয়া জায়েয নয়, তেমনি স্ত্রীর জন্যও তালাক চাওয়া উচিত নয়।

হাদীসে তালাককে অত্যন্ত ঘৃণিত ও অপছন্দনীয় একটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উমর ইবনুল খাত্তাব সূত্রে বর্ণিত, নবীজি ইরশাদ করেন-

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

'আল্লাহ তাআলার কাছে বৈধ কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ হলো তালাক।'
(আবু দাউদ, হাদীস-ক্রম: ২১৭৮)

শরীয়তে তালাকের বিধান রাখা হয়েছে কেবল অতীব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য যদি এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পৌঁছে, যেখান থেকে তাদের আর উতরে ওঠা সম্ভব না; অথবা স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়, উশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়, কোনোভাবেই তাকে সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে একজন স্বামী তালাকের সিদ্ধান্তে যেতে পারে। তবে তার আগে স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীকে শোধরানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।

তালাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে স্বামীকে কয়েকটি ধাপের কথা বলেছে ইসলাম।

প্রথম ধাপ:

স্ত্রীর অবাধ্যতা দেখেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না; বরং নিজেকে সংযত রাখতে হবে এবং কোমল ভাষায় তাকে বোঝাতে হবে। প্রেম ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে তার মন

গলানোর চেষ্টা করতে হবে। স্ত্রী যদি কোনো ভুল ধারণায় থাকে, তাহলে তা থেকে তাকে ফেরাতে হবে। সর্বোপরি নিজেকে সংযত রেখে দাম্পত্য-জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে স্বামীকে।

দ্বিতীয় ধাপ:

প্রথম ধাপের ব্যবহারে স্ত্রীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন না এলে অবাধ্যতা ও আচরণগত বিচ্যুতির কারণে স্বামী তার প্রতি অভিমান প্রকাশ করবেন। এই অভিমানের জেরে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে রাত্রিযাপন ত্যাগ করে আলাদা বিছানায় ঘুমোতে পারেন।

তৃতীয় ধাপ :

বিছানা পৃথকের পরও যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে সে-ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক সালিসের মাধ্যমে তাদের মধ্যকার সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করা।

এরপরও যদি মীমাংসা না হয়, তাহলে একজন স্বামী তালাকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে, তালাক অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। কেউ এই ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কিংবা ভুল পন্থায় তা প্রয়োগ করলে সে একদিকে যেমন গুনাহগার হবে, অন্যদিকে তালাকও কার্যকর হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি বিবেচক স্বামীর দায়িত্ব হলো, তালাকের শব্দ কিংবা এর সমার্থক কোনো শব্দ মুখে উচ্চারণ করা থেকে সতর্কতার সাথে বিরত থাকা।

তালাকের নিয়ম ও পদ্ধতি

তালাকের পদ্ধতি: উপরোল্লিখিত ধাপ অতিক্রম করবার পর কোনো স্বামী যদি তালাক প্রদানে বাধ্য হন, তাহলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শুধু এক তালাক দেবেন। এভাবে বলবেন, 'তোমাকে তালাক দিলাম।' তালাকের সাথে 'বায়েন' শব্দ কিংবা ৩ সংখ্যা ব্যবহার করবেন না। কেউ 'বায়েন' শব্দ বলে ফেললে (চাই তা এক বা দুই তালাক হোক না কেন) নতুন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো ছাড়া স্ত্রীর সাথে পুনরায় মিলনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে তিন তালাক দিয়ে ফেললে (একই মজলিসে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া হোক কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হোক) যেমন বলল, 'তোমাকে তিন তালাক দিলাম।' অথবা আগে কখনো দুই তালাক দিয়েছিল আর এখন শুধু এক তালাক দিল। সর্বমোট তিন তালাক দেওয়া হলো।

তা এক বা দুই তালাক হোক না কেন) নতুন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ দোহরানো ছাড়া স্ত্রীর সাথে পুনরায় মিলনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে তিন তালাক দিয়ে ফেললে (একই মজলিসে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া হোক কিংবা একই শব্দে তিন তালাক দেওয়া হোক) যেমন বলল, 'তোমাকে তিন তালাক দিলাম।' অথবা আগে কখনো দুই তালাক দিয়েছিল আর এখন শুধু এক তালাক দিল। সর্বমোট তিন তালাক দেওয়া হলো। যেকোনো উপায়ে তিন তালাক দেওয়া হলে বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় শুধু মৌখিকভাবে স্ত্রীকে বিবাহে ফিরিয়ে আনার যেমন কোনো সুযোগ থাকে না, তেমনি নতুন করে বিবাহ দোহরানোর মাধ্যমেও ফিরিয়ে নেওয়ার পথ খোলা থাকে না।

একসাথে তিন তালাক দেওয়া কিংবা বিভিন্ন সময় তালাক দিতে দিতে তিন পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া একটি জঘন্য অপরাধ ও ঘৃণিত কাজ। আল্লাহ তাআলা এর শাস্তি হিসেবে এই বিধান দিয়েছেন যে, তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পুনরায় একসাথে বসবাস করতে চাইলে স্ত্রীর ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর অন্যত্র তার বিয়ে হওয়া এবং সে স্বামীর সাথে তার মিলন হওয়া অপরিহার্য। এরপর কোনো কারণে সে তালাকপ্রাপ্তা হলে কিংবা স্বামীর মৃত্যু হলে ইদ্দত পালনের পর এরা দুজন পরস্পর সম্মত হলে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

এজন্য শরীয়ত আগেই এই মর্মে সাবধান করে দিয়েছে যে, প্রথমত তালাকের কথা চিন্তাও করবে না। তবে অতীব প্রয়োজনে কখনো তালাক প্রদানের প্রয়োজন হলে শুধু সাদামাটা তালাক দাও, শুধু এক তালাক। যেন উভয়ের জন্যই নতুন করে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ থাকে এবং পুনরায় ফিরে আসার পথ খোলা থাকে। এরপর আবারও কোনো সমস্যা দেখা দিলে এভাবেই শুধু এক তালাক দেবে। এখনও ফিরে আসার পথ খোলা থাকবে।

কিন্তু এরপর যদি আবার কখনো শুধু এক তালাকই দেওয়া হয় এবং সব মিলে তিন তালাক হয়ে যায়, এ অবস্থায় আর তাকে ফিরিয়ে আনারও সুযোগ থাকবে না, নতুন করে বিয়ে করার বৈধতাও বাকি থাকবে না।

দাম্পত্য জীবন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় ও বিশেষ একটি নেয়ামত। স্বামী-স্ত্রী সকলের কর্তব্য, এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং দাম্পত্য জীবন যথাযথ মূল্যায়ন করা।

একে অপরের সকল অধিকার আদায় করা। স্ত্রীর জন্য উচিত নয়, কথায় কথায় স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া। আবার স্বামীর জন্যও জায়েয নয় আল্লাহ তাআলার দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করা।